মহাবিশ্ব: অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

//// প্রতি অধ্যায়ের শুরুতে সারসংক্ষেপ যোগ করতে হবে

বিন্যাস

* অতীত
* বর্তমান
* ভবিষৎ
* তত্ত্ব (যেমন দূরত্বের এককেরা, পরিশিষ্টেও থাকতে পারে)
* পরিভাষা

**বিগ ব্যাং থেকে প্রতি মহাবিশ্ব**

এক সময় মনে করা হত মহাবিশ্বের কোনো শুরু বা শেষ নেই। সব সময় ছিল একই রকম। নেই কোনো পরিবর্তনও। ১৯২৭ সালে বেলিজিয়ান জ্যোতির্বিদ জর্জ লেমিত্রি তাত্ত্বিকভাবে প্রসারণশীল মহাবিশ্বের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন করেন। কিছু দিন পরেই হাবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করেন। জানা গেল, মহাবিশ্ব স্থির বসে নেই। প্রতিনিয়ত বড় হচ্ছে। প্রসারিত হচ্ছে। তার মানে অতীতে নিশ্চয়ই এটি অতি ঘন ও উত্তপ্ত একটি বিন্দুতে গুটিয়ে ছিল। যেখান থেকে এক অজানা উপায়ে এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে জন্ম মহাবিশ্বের।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঠিকতা যাচাই হয় দুটি মাপকাঠি দিয়ে। পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে পূর্বাভাস। দুটো পরীক্ষায়ই বিগ ব্যাং তত্ত্ব ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়। বিখ্যাত কিছু বিজ্ঞানী তবুও গোঁ ধরে বসেছিলেন। প্রথমে বিপক্ষে থাকলেও আইনস্টাইন পরে মেনে নিয়েছিলেন বিষয়টি। বড় কাঠামোর মহাবিশ্ব চলে আইন্সটাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা দিয়ে। কিন্তু আইন্সটাইন নিজে মনে করতেন মহাবিশ স্থির। আর তাই তত্ত্বের ইঙ্গিতকে আমলে না নিয়ে সমীকরণে অতিরিক্ত একটি ধ্রুবক বসিয়ে দেন। হাবল গ্যালাক্সির পর্যবেক্ষণ করতেন মাউন্ট উইলসন পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে বসে। পরে আইনস্টাইন সেখানে গিয়ে হাবলের সঙ্গে দেখা করে নিজের ভুল স্বীকার করে নেন।

আরেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করেননি। বিখ্যাত এই ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ নক্ষত্রের নিউক্লিওসংশ্লেষের জনক। ফিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিন্ন পরমাণুর নিউক্লিয়াস জোড়া লেগে বড় পরমাণু তৈরি প্রক্রিয়ার নামই হলো নিউক্লিওসংশ্লেষণ। তবে তিনি বিগ ব্যাং তত্ত্বের বিরোধিতা করেও প্রায় সমান খ্যাতি (!) কুড়িয়েছিলেন। এমনকি বিগ ব্যাং কথাটাও প্রথম তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়েছিল। অবশ্যই ব্যাঙ্গ করে বলেছিলেন। বিবিসি রেডিওর এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "কোনো এক দূর অতীতে নাকি এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) মাধ্যমে নাকি মহাবিশ্বের জন্ম।" পরে ঐ নামটিই জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। অবশ্য পরে হয়েল দাবি করেন, কথাটা তিনি ব্যাঙ্গ করে বলেননি। প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

নামকরণকে সার্থক না বলে উপায় নেই। যাই হোক, বিগ ব্যাং থেকে শুধু একটি মহাবিশ্বের জন্ম বলে আমরা জানি। তবে বিজ্ঞানী নিল টারক এ বিষয়ে দিয়েছেন নতুন আরেকটি তত্ত্ব। তিনি ও পেরিমিটার ইনস্টিটিউটের তাঁর সহকর্মীদের গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে আরও বাড়তি কিছু কথা। বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে একটি নয়, জন্ম হয় দুটি মহাবিশ্বের। একটির নাম ইউনিভার্স বা মহাবিশ্ব হলে অপরটির নাম তাহলে অ্যান্টি-ইউনিভার্স বা প্রতি-মহাবিশ্ব।

সাধারণ আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স দুটি তত্ত্বেই এমনিতে মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্বের ধারণা পাওয়া যায়। তবে এখানে প্রতি-মহাবিশ্বের ধারণাটা একটু আলাদা। তত্ত্বটি বলছে, বিগ ব্যাং এর সময় আমাদের চেনাজানা স্বাভাবিকভাবে যাত্রা করলেও প্রতি-মহাবিশ্ব যাত্রা করে সময়ের উল্টো দিকে। অনেকটা দর্পণ-চিত্রের মতো। বিষয়টাকে খুব হাস্যকর মনে হলেও ডার্ক এনার্জির মতো রহস্যময় জিনিসকে ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য আছে তত্ত্বটির।

তত্ত্বটির নাম বেশ গালভরা। সিপিটি প্রতিসাম্য। বিখ্যাত জার্নাল ফিজিকেল রিভিউ অব লেটার্সের প্রকাশিত হয়েছে তত্ত্বের কথাবার্তা। প্রতি-মহাবিশ্বে সময়ের কাঁটা চলা শুরু করে পেছন দিকে। আবার আমাদের মহাবিশ্ব মূলত তৈরি ম্যাটার বা পদার্থ দিয়ে। অন্য দিকে, বলা হচ্ছে প্রতি-মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে মূলত অ্যান্টি-ম্যাটার বা প্রতি-পদার্থ দিয়ে। প্রতি-পদার্থ কিন্তু নিছক তাত্ত্বিক কিছু নয়। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত একতী পেপারের মাধ্যমে পল ডিরাক অ্যান্টিম্যাটারের ধারণা দেন। ১৯৩২ সালে কার্ল অ্যান্ডারসন ইলেকট্রনের প্রতিকণা পজিট্রন আবিষ্কার করেন। প্রমাণ হয় প্রতিকণা ও প্রতি-পদার্থের অস্তিত্ত্ব। ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক হলেও পজিট্রনের চার্জ ধনাত্মক। এভাবে তাত্ত্বিকভাবে সকল কণা ও পদার্থের প্রতিকণা ও প্রতিপদার্থ আছে। যেমন প্রতি-পানি, প্রতি-সূর্য, প্রতি-আপনি ইত্যাদি। তাই প্রতি-পদার্থে গড়া মহাবিশ্বকে প্রতি-মহাবিশ্বই বলা উচিত বটে।

টারক ও সহকর্মীরা একটি অভাবনীয় উপায়ে কাজ করেন। তাঁরা মহাবিশ্বের এমন একটি মডেল তৈরি করার চেষ্টা করেন যেটি শুধুমাত্র চেনাজানা কণা ও ফিল্ডের মাধ্যমেই দেখা মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা দিতে পারবে। এই যেমন হিগস কণা এবং কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি ফিল্ড, অ্যাক্সিয়ন, দুর্বল মিথষ্ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ভারী কণা (WIMP), মহাকর্ষীয় মিথষ্ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ভারী কণা (GIMP) ইত্যাদি।

বিগ ব্যাং এর বাইরেও আরও কিছু আছে কিনা সেটাই দেখতে চাচ্ছিলেন তাঁরা। । বিগ ব্যাং মানেই কিন্তু দূর অতীতের সেই ঘন বিন্দু। নাম যার সিঙ্গুলারিটি। যেখানে গিয়ে ভেঙে পড়ে প্রচলিত পদার্থবিদ্যার সব সূত্র। তাই তাঁরা দেখলেন, একটুখানি উঁকি মেরে সিঙ্গুলারিটির ওপারে কী আছে সেটা দেখা যায় কিনা। দেখা গেল, দেখার উপায় ভাছে। আর সেই দেখা জিনিসটাই চেনা মহাবিশ্বের দর্পণ-চিত্রের মতো প্রতি-মহাবিশ্ব।

এই তত্ত্বখানি কিন্তু একটি জায়গায় খুবই শক্তিশালী। এটি সম্পূর্ণভাবে চেনাজানা কণার ওপর নির্ভর করছে। অন্য অনেক তত্ত্বের মতো নতুন কিছু ভূতুড়ে কণার অস্তিত্ত্বের ওপর এর নির্ভুলতা নির্ভর করছে না। নতুন কণার অনুমান ছাড়াই এটি রহস্যময় ডার্ক ম্যাটার্কেও ব্যাখ্যা করতে পারছে।

মহাবিশ্বের প্রথম আলো

আজকের মহাবিশ্ব তো আলোয় ভরপুর। অন্তত আমরা খালি চোখে তাই মনে করি। মেঘমুক্ত রাতের আকাশে মিটমিট করে তারারা আলো দেয়। যদিও মহাকাশের গভীরে তীব্র অন্ধকার আজও আছে। তবে সেই ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, সব দিকেই তো নক্ষত্ররা আছে। তাহলে অন্ধকার জায়গা আসবে কোথা থেকে? পরক্ষণেই চিন্তা করলে বোঝা যায়, নক্ষত্ররা আছে বেশ দূরে দূরে। দূরত্বের সাথে সাথে আলোর তীব্রতা মারাত্মকভাবে কমে যায়। দূরত্ব দ্বিগুণ হলে তীব্রতা হয়ে যায় চারভাগের এক ভাগ। এই নিমের নাম বিপরীত বর্গীয় সূত্র। ফলে, এমনও জায়গা আছে, যেখানে নক্ষত্রের আলোরা আসতে আসতে সেই আলোদের তীব্রতা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

কিন্তু জটিলতার এখানেই শেষ নয়। নক্ষত্রদের সংখ্যা আসলে এত বেশি যে এমন কোনো স্থান পাওয়া কঠিন, যেখানে অগুণতি নক্ষত্রের দুর্বল আলোগুলোর মিলিত রূপ নগণ্য হয়ে যাবে। মানে, পুরো মহাবিশ্ব আলোয় আলোয় ভরপুরই থাকার কথা। কিন্তু তবুও দূর মহাকাশ অন্ধকার। এর পেছনে মূল কারণ মহাবিশ্বের প্রসারণ। মহাবিশ্বের সবটুকু জায়গাকে আলো দিয়ে ভরপুর করার মতো যথেষ্ট সময় এখনও পার হয়নি। নক্ষত্ররা এত দূরে দূরে আছে যে তাদের আলোগুলো মিলিত হয়ে উজ্জ্বল স্থান তৈরির সময় এখনও পায়নি। আর ক্রমাগত আরও দূরে তো সরছেই।

কিন্তু এ তো গেল গভীর মহাকাশের অন্ধকারের কথা। সব জায়গা কিন্তু অন্ধকার নয়। সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তবে একসময় কিন্তু মহাবিশ্বের পুরোটাই অন্ধকারের চাদরে আবৃত ছিল। আলোকিত অবস্থায় জন্ম হয়নি মহাবিশ্বের। ১৩৮০ কোটি বছর আগের বিগ ব্যাং নামের মহাবিস্ফোরণটি আর দশটা বিস্ফোরণের মতো আলোর বিচ্ছুরণ তৈরি করেনি।

মহাবিশ্ব কবে আলোকিত হয়েছিল সেটা জানতে আমরা কাজে লাগাই আলোর ধর্মকেই। আলোর বেগের বিশালতা দেখে আমরা শিহরিত হই। প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার। চাট্টিখানি কথা? কিন্তু মহাবিশ্বের মাপকাঠিতেই এই বেগ কিছুই নয়। এই বেগ অল্প বলেই আমরা এই মুহূর্তে যে সূর্যকে দেখছি সেটা ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড আগের সূর্য। কারণ, সূর্য থেকে আলো আমাদের চোখে আসতে এই সময়টুকু লেগেই যায়। এই অসুবিধাই আবার সুবিধা। আমরা মহাবিশ্বের যত গভীরে তাকাবো, তত অতীত দেখতে থাকব। এ কারণেই আমরা লাল বেটেলজিউস নক্ষত্রের ৬৪২ বছর আগের অবস্থা দেখছি। প্রতিবেশী আন্ড্রোমিডা ছায়াপথকে দেখছি ২৫ লক্ষ বছর আগের অবস্থায়।

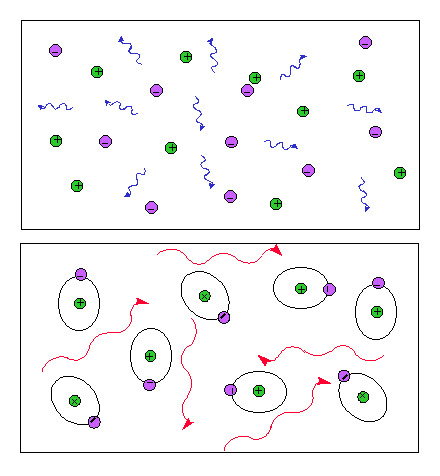
এবার ঘড়ির কাঁটাকে একটু পেছনে ঘোরাই। চলে যাই মহাবিশ্বের শুরুর অবস্থায়। যেতে যেতে এমন এক জায়গায় পৌঁছব, যে স্থানটা বর্তমানের চেয়ে ঘন ও উষ্ণ। এতটাই ঘন যে বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরের মহাবিশ্বটা ছিল প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন কণায় পরিপূর্ণ স্যুপের মতো। উত্তাপের প্রভাবে কণাগুলো ছিল একে ওপর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়।

একটু পর মহাবিশ্ব আরেকটু প্রসারিত হলো। তাপমাত্রাও একটু কমল। ঘনত্ব ও তাপমাত্রা এবার সূর্যের মতো নক্ষত্রদের কেন্দ্রের মতো হলো। মানে প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় এবার আয়নিত হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরির সুযোগ হলো। পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যার ভিন্নতা হলে তাকে আয়নিত অবস্থা বলে।

সূর্যের মতো নক্ষত্রদের কী হয় তা আমরা জানি। হাইড্রোজেনরা জোড়া লেগে হিলিয়াম তৈরি হয়। মহাবিশ্বের সেই অবস্থাটিও নক্ষত্রের কেন্দ্রেই মতোই। ফলে একই ঘটনা ঘটল। প্রায় একই রকম চাপ ও তাপমাত্রা থাকায় এক প্রোটনবিশিষ্ট হাইড্রোজেনরা জোড়া লেগে লেগে তৈরি হলো দুই প্রোটনের হিলিয়াম। ক্রমে তৈরি হলো আরও বেশি প্রোটনের পরমাণুরাও। মানে আরও ভারী পরমাণু। পর্যবেক্ষণ বলছে, বর্তমানে মহাবিশ্বে প্রায় ৭৪ ভাগ হাইড্রোজেন, ২৫ ভাগ হিলিয়াম ও ১ ভাগ অন্যান্য পরমাণু আছে। এটা থেকে আমরা হিসেব করে বলতে পারি, মহাবিশ্ব এ অবস্থায় কতটা সময় ছিল। মানে, কতক্ষণ সময় যাবত পুরো মহাবিশ্বই নক্ষত্রের মতো ছিল।

হিসেব বলছে, সময়কালটা প্রায় ১৭ মিনিট। বিগ ব্যাংয়ের ৩ মিনিট পর থেকে প্রায় ২০ মিনিট পর পর্যন্ত। এই সময়ে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হতে থাকে। নক্ষত্রেও ঘটা একই প্রক্রিয়াটির নাম নিউক্লীয় ফিউশন। এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় গ্যামা বিকিরণের ফোটন। সূর্যের ক্ষেত্রে এই আলোর কণাগুলো পরমাণু থেকে পরমাণুতে লাফিয়ে লাফিয়ে কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে চলে আসে। ছড়িয়ে পড়ে দূরে আকাশে। পৃথিবীতে। এই প্রক্রিয়ায় সময় লেগে যায় কয়েক অযুত বছর সময়। তবে প্রাথমিক মহাবিশ্বে গ্যামা বিকিরণের এই আদি ফোটন কণাগুলোর যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না। কারণ সবদিকই ছিল আরও বেশি উষ্ণ ও ঘন। এ কারণে আলোর কণা উপস্থিত থাকলেও মহাবিশ্ব ছিল অন্ধকার। অস্বচ্ছ (opaque)।

ওদিকে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছিল। বিগ ব্যাংয়ের কয়েক লক্ষ বছর পরের কথা। মহাবিশ্বের উত্তাপ আরও কমল। প্রায় ৩ হাজার কেলভিন বা প্রায় ২৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। (কেলভিনকে সেলসিয়াস স্কেলে নিতে চাইলে ২৭৩.১৫ বিয়োগ করুন)। এবার হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণুরা মুক্ত ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করছে। পরিণত হচ্ছে স্বাভাবিক পরমাণুতে। আগে তো ছিল আয়নিত অবস্থায়। এটাই ছিল মহাবিশ্ব্বের প্রথম আলোকোজ্জ্বল অবস্থা। ঘটনাটি বিগ ব্যাংয়ের ২ লক্ষ ৪০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ বছর পরের সময়কালে ঘটা। সময়কালটিকে বলা হয় পুনর্মিলন যুগ (recombination era)। ইলেকট্রন ও প্রোটনের মিলনের কারণেই নামটি দেওয়া। তবে মিলন বললেই চলত। "পুনঃ" কথাটা আসলে বাড়াবাড়ি। কারণ, এর আগে কখনও এই কণাদুটি মিলিত ছিল না। এই প্রথম ফোটন কণা ইলেকট্রন হিসেবে পরমাণুতে স্থির হয়ে ঠাঁই নেওয়ার সুযোগ পেল। মহাবিশ্বও অস্বচ্ছ ও অন্ধকার থেকে আলোকিত।হবার জন্য প্রস্তুত হলো।



চিত্র: রিকম্বিনেশন

জ্যোতির্বিদরা সর্বোচ্চ এই সময়ের আলোই দেখতে পারেন। এই আলোর অস্তিত্ব এখনও আছে। তবে সেই আগের রূপে নয়। প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর ধরে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। তার ফলে সেই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লম্বা হয়ে গেছে। সরে গেছে লাল বর্ণের দিকে। অতিবেগুনি থেকে ক্রমশ সরে গেছে দৃশ্যমান আলোর পরিসরের দিকে। তাতেই থামেনি। দৃশ্যমান আলোর পরিসর ছাড়িয়ে আরও লম্বা হয়ে চলে গেছে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের দিকে। মানে, অতীতের সেই আলো এখনও মহাবিশ্বে আছে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ আকারে। এর একটি গালভরা নামও আছে। মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি (cosmic microwave background)।

তবে এত বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আমরা মানুষরা দেখতে পাই না। মাইক্রোওয়েভ আলো দেখতে পারলে আমরা কি দিন কি রাত, চতুর্দিক আলোয় ভরপুর দেখতে পেতাম।

আলোর প্রাথমিক এই স্ফুরণের পরও সবিকছু অন্ধকার। আলো বিকিরণ করার মতো নক্ষত্র যে এখনও আসেনি। আছে শুধু প্রারম্ভিক কিছু মৌলিক পদার্থ। পুনর্মিলন যুগ থেকে শুরু করে প্রথম নক্ষত্র তৈরি পর্যন্ত সময়কে বলে অন্ধকার যুগ। অন্ধকার যুগের শুরুতে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ৪ হাজার কেলভিন। সেই তাপমাত্রাই কমে এখন হয়েছে মাত্র ২.৭ কেলভিন। অন্ধকার যুগের স্থায়ীত্ব ছিল প্রায় ১৫ কোটি বছর। যুগের শেষে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৬০ কেলভিন।

পরের ৮৫ কোটি বছর দারুণ ঘটনা ঘটতে শুরু করল। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামে গড়া বিশাল বপু নক্ষত্রের জন্ম শুরু। ভারী মৌলিক পদার্থ না থাকায় প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম একীভূত হবার সুযোগ পেল। ফলে আমাদের সূর্যের কয়েকশ গুণ পর্যন্ত ভারী নক্ষত্র তৈরি হলো। এই নক্ষত্রগুলোকে বলা হয় ৩য় প্রজন্মের বা প্রথম নক্ষত্র। এদেরকে দেখার মতো শক্তিশালী টেলিস্কোপ এখনও বানানো সম্ভব হয়নি। পরোক্ষ হিসেব বলছে, এদের জন্ম হয়েছিল বিগ ব্যাংয়ের প্রায় ৫৬ কোটি বছর পরে।

একসময় স্বাভাবিক নিয়মে এরা সুপারনোভা হিসেবে বিস্ফোরিত হলো। বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষ থেকে তৈরি হলো আরও আরও ভারী নক্ষত্র। তাদের ভাগ্যেও ঘটল একই পরিণতি। এই সময়টায় পুরো মহাবিশ্বে আতশবাজির মতো শুধু নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটত। পুরো মহাবিশ্ব সেই আতশবাজির আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এ সময়টার নাম পুনঃআয়নীকরণ যুগ। উত্তপ্ত প্লাজমা পদার্থ দিয়ে পুরো মহাবিশ্ব ভর্তি।



চিত্র ২: পুনঃআয়নীকরণ যুগ ছিল আজ থেকে প্রায় ১৩০০ কোটি বছর আগে।

তারপর আরও অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে মহাবিশ্ব। আজ পুরো মহাবিশ্ব আলোকিত নয়। সেটা আমরা আগেই বলেছি। এক সময় আবার মহাবিশ্ব অন্ধকারের দিকে চলে যাবে। তবে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর বিষয় হলো, আমাদের চতুর্দিকে আজও অস্তিত্বমান প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগের মহাবিশ্বের আলো। আমরা খালি চোখে সেটা দেখছি না এই যা। শুধু আমরাই না, অন্য প্রাণীরাও দেখে না মাইক্রোওয়েভ আলো। যদিও অনেক প্রাণীই এমন আলো দেখে না যেটা আমরা দেখি না। যেমন অনেক প্রজাপতি অতিবেগুনি আলো দেখে। সাপসহ অনেক প্রাণীই আবার দেখে অবলোহিত আলো। বিস্তারিত না হয় আমরা অন্য সময় জানি।

সূত্র: সায়েন্সফোকাস, ফিজ ডট অর্গ, স্পেস ডট কম, কর্নেল ডট এজু, দ্য আটলান্টিক ডট কম।

https://www.sciencefocus.com/space/why-is-space-dark/

<https://phys.org/news/2016-11-universe.html>

https://www.space.com/17137-how-hot-is-the-sun.html

http://hosting.astro.cornell.edu/academics/courses/astro201/recombination.htm

<https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_the_universe#Photon_epoch>

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/08/6-animals-that-can-see-or-glow-in-ultraviolet-light/243634/

<https://sciencing.com/animals-can-see-infrared-light-6910261.html>

মহাবিশ্বটা কি বাস্তব?

প্রশ্নটাকে অযৌক্তিক মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। বাস্তব যে তার প্রমাণ তো আমরাই। মহাবিশ্বের সব বস্তু, উপাদান তো আছে আমাদের চোখের সামনেই। দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি, অনুভব করছি। তবুও কীভাবে অবাস্তবতার প্রশ্ন আসে?

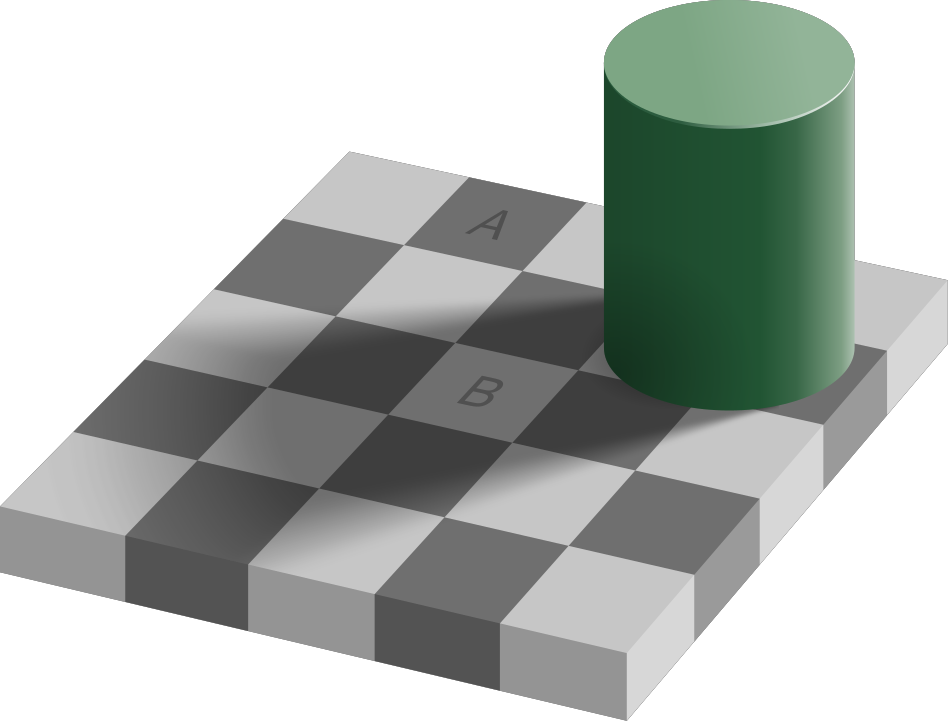
আসা সম্ভব কি না সেটাই আমরা একটু যাচাই করে দেখতে চাই। যাচাই করতে তো আর দোষ নেই, তাই না?

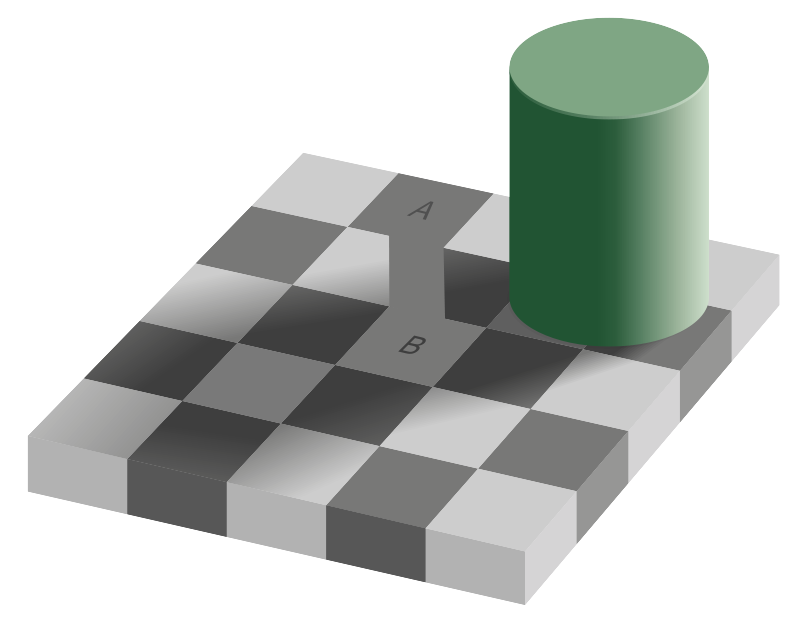
শুরুতে দুই একটা প্যারাডক্সিকেল ঘটনার কথা বলে রাখি। আসলে মহাবিশ্বটা আমরা যেমন দেখি আসলেই কি সেটা তেমনই? আমাদের দেখার বা বোঝার ক্ষমতা আসলে কতটুকু? আমরা দেখে যা মনে করি জগতটা কি আসলে ঠিক তেমনই?

ছোট্ট একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি।

নীচের ছবিটা একটু ভাল করে লক্ষ করুন।

একটি চেকারবোর্ড দেখা যাচ্ছে। যার প্রতিটি সারিতে ৫টি করে ছোট বর্গ আঁকা আছে। এক কোণায় রাখা একটি সিলিন্ডার। বর্গগুলো দেখে মনে হচ্ছে কোণাকুণি বরাবর বিবেচনা করলে এক সারির সব সাদা (বা ধূসর)। আবার তার পার্শ্ববর্তী সারির বর্গগুলো সব কালো রংয়ের। তাহলে A এবং B চিহ্নিত বর্গের রং আলাদা হবার কথা।

অবিশ্বাস্য কথাটা এবার বলেই ফেলি। আসলে দুটো বর্গের রং একই। ছবিটি এক ধরনের আলোকীয় বিভ্রম (optical illusion)। এর নাম চেকার শ্যাডো ইলুজন। প্রমাণ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ছবিটিকে কোনো ইমেজ এডিটর সফটওয়্যারে নিয়ে দুটো বর্গের ওপর আইড্রপার টুল প্রয়োগ করা। প্রিন্ট করে নিয়ে সবগুলো বর্গ কেটে নিয়েও যাচাই করে দেখতে পারেন। দেখতে পারেন নীচের ছবিটিও।

সহজেই আমাদের প্রাথমিক ভুল ধরা পড়ছে। আচ্ছা এটা না হয় মেনেই নিলাম, এখানে আমাদের ভুল হতেই পারে। তাই বলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ভুল হয়ে যেতে হবে?

সে আলোচনায় যাওয়ার আগে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা কথা না বললেই নয়। এটি বলছে, পর্যবেক্ষণ করার আগ পর্যন্ত একটি ঘটনা সম্ভাব্য সব অবস্থায় বিরাজ করে। পর্যবেক্ষণ বা পরিমাপ করার ফলেই ঘটনাটি একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় রূপ নেয়। এখান থেকেই শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল প্যারাডক্সের উদ্ভব। শ্রোডিঙ্গার সাহেব আইনস্টাইনের মতোই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এই কথাটা মানতে পারতেন না। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, পর্যবেক্ষণ করার আগে কি একটি বিড়াল একটি বিষাক্ত বাক্সে একই সাথে মৃত ও জীবিত অবস্থায় থাকে। আইনস্টাইন তো রঙ্গ করে বলেছিলেন, আমরা যখন তাকিয়ে থাকি না, তখন কি আকাশে চাঁদ থাকে না? তবে আইনস্টাইনের রঙ্গ সত্ত্বেও পারমাণবিক জগতে কথাগুলোর কিন্তু ভিত্তি আছে। আর এই কথাগুলোর সত্যতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান সভ্যতা। আপনার হাতের মোবাইলের মাইক্রোচিপ, এমআরআই, কোয়ান্টাম কম্পিউটিংসহ নানান ক্রিয়াকৌশল।

কিন্তু তাই বলে অবাস্তব মহাবিশ্ব? আচ্ছা, এবার মূল আলোচনাতেই তাহলে ফিরে যাওয়া যাক।

১৯৮২ সালের কথা। ঐ বছর গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে। ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী অ্যাঁলে অ্যাসপের নেতৃত্বে একটি অভিনব পরীক্ষা পরিচালিত হয়। হয়তবা এটাই হবে বিংশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। পরীক্ষাটি হয়ত সেভাবে গুরুত্বের সাথে পত্রিকায় আসেনি। বিজ্ঞানের খবরাখবর না রাখলে হয়ত অ্যাসপের নামটিও আপনার নাও শোনা হয়ে থাকতে পারে। তো, তারা কী এমন করলেন যে নামটি শোনা উচিত ছিল?

অ্যাসপের দল দেখালেন, কিছু কিছু অবস্থায় ইলেকট্রনের মতো অতিপারমাণবিক কণিকারা বহু দূরে থেকেও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে। সে যত বড় দূরত্বই হোক না কেন। তারা ১০ ফুট দূরে আছে কি ১০ লক্ষ কোটি দূরে, সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। কোনোভাবে যেন একটি কণা জেনেই যায় অন্য কণা কী করছে। অন্য দিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলছে, কোনো তথ্যই আলোর চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারে না। ফলে উপরোক্ত ঘটনা সেই নীতির বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। যদিও দুটো ঘটনার সমন্বয় করাও সম্ভব, তবুও একটুখানি যদি-কিন্তুর অবকাশ থেকেই যায়। সেটা ভিন্ন আলোচনা। সেদিকে আপাতত না গিয়ে আমরা দেখতে চাই কণাদের এই অদ্ভুত বিজড়নের ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয় কি না। ঘটনাটির কেতাবি নাম কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গেলমেন্ট।

আমেরিকান তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ডেভিড বোমও ভেবেছেন ভিন্ন কিছু। ভদ্রলোককে বিংশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদার্থবিদ বলা হত। তাঁর মতে, অ্যাসপের পরীক্ষালব্ধ ফলের অর্থ হবে বাস্তবতার অস্তিত্ব নেই। দেখতে পরম বাস্তব মনে হলেও মহাবিশ্ব আসলে একটি কাল্পনিক বস্তু। একটি বিশাল বপুর হলোগ্রাম।

এত বড় দাবির সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে প্রথম কাজ হওয়া উচিত হলোগ্রাম সম্পর্কে ভালো একটু হলেও জানা। হলোগ্রাম হলো একটি ত্রিমাত্রিক চিত্র, যা লেজার আলোর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। হলোগ্রাম তৈরির পদ্ধতিকে বলে হলোগ্রাফি। হলোগ্রামে লেজার আলো ব্যবহার করার কারণ হলো এখানে সবগুলো রশ্মি সমান সাইজের হয়। একই সাথে তরঙ্গিত হয়। একটি নির্দিষ্ট রংয়ের আলো থাকে শুধু। প্রিজম বা লেন্সের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় সাদা আলো বিভিন্ন রংয়ের আলোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু লেজার রশ্মি একবর্ণী ও সমান সাইজের হওয়ায় চলার পথে সবগুলো আলোকরশ্মি একইসাথে থাকে।

তবে হলোগ্রামে থাকে একটিমাত্র লেজার রশ্মি। যে বস্তুর হলোগ্রাম বানানো হবে প্রথমে তাকে লেজার রশ্মির মধ্যে ডুবানো হয়। বিশেষ লেন্সের সাহায্যে লেজার রশ্মিটিকে ভেঙে দুটি রশ্মি বানানো হয়। এতে করে একই সাইজের দুটি লেজার রশ্মি পাওয়া যায়। এর একটিকে বলা হয় রেফারেন্স রশ্মি। একে সরাসরি ফিল্মে প্রক্ষেপ করা হয়। দ্বিতীয় রশ্মিটিকে যে বস্তুর হলোগ্রাম বানানো হবে সেটা থেকে প্রতিফলিত করা হয়।

দুটি রশ্মি মিলিত হলে একটি ব্যতিচার নকশা হয়। আলো বা অন্য কোনো তরঙ্গের দুটি ধারার মিলনের ফলে তরঙ্গের বিস্তার বড় বা ছোট হওয়ার নাম ব্যতিচার। এটা বাস্তবে দেখতে চাইলে পুকুরে দুই দিকে থেকে দুটি ঢিল মেরে তাদের মিলন দেখে নিতে পারেন। আলোর ব্যতিচারের ক্ষেত্রে রংয়ের নকশা পাওয়া যায়। আর হলোগ্রাম বানানোর জন্যে ব্যতিচার থেকে পাওয়া নকশাই ফিল্মে রেকর্ড করা হয়। ফিল্মটাকে ডেভেলপ করা হলে শুরুতে একে আলো ও অন্ধকারের আঁকিবুঁকি মনে হবে। কিন্তু একে আরেকটি লেজার রশ্মি দ্বারা আলোকিত করা হলে পুরো ছবিটিই ফুটে ওঠে।পাওয়া যায় ত্রিমাত্রিক ছবি।

হলোগ্রাম সম্পর্কে আরেক মজার ব্যাপার হলো, ফিল্মে ধারণ করার সময় পুরো ছবিটাই পুরো ফিল্মজুড়ে ধারণ করা হয়। ফলে একটি ফুলের হলোগ্রামের ফিল্মকে অর্ধেক করে ফেললেও আপনি পুরো ফুলটাই দেখতে পারবেন। বিষয়টা অনেকটা এমন: আপনি পুরো জানালা দিয়ে তাকিয়ে একটি গাছ দেখছেন। অর্ধেকটা জানালা দিয়ে তাকালেও পুরো গাছটি দেখবেন। হলোগ্রাম নিজে দ্বিমাত্রিক হলেও (যা কাগজে ছাপা দেখি আমরা) এতে ত্রিমাত্রিক বস্তুর সব বৈশিষ্ট্য থাকে। একইভাবে অর্ধাংশকে আবারও অর্ধকে করলেও সেই পুরো ছবিই থাকবে। তার মানে সাধারণ ছবির বদলে হলোগ্রামের পুরো অংশে ছবির পুরো তথ্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় *হোল ইন এভরি* পার্ট বা প্রতি অংশে পূর্ণ।

২০১৫ সালে স্পেনে একটি হলোগ্রাম মিছিল হয়েছিল। মিছিলটি হয় সরকারের একটি আইনের বিরুদ্ধে। সরকারি ভবনের আশেপাশে সভা-সমাবেশের জন্য কড়া জরিমানা করে আইন প্রস্তাবের বিপক্ষে হয় মিছিলটি। মজার ব্যাপার হলো, মিছিলে সত্যিকার মানুষরা অংশ নেননি। বরং আলো প্রক্ষেপণের মাধ্যমে মানুষের প্রতিকৃতি দিয়ে হলোগ্রাম মিছিল বানানো হয়েছিল। দেখে কিন্তু মনে হবে সত্যিকার মানুষরাই মিছিল করছে।

হোল ইন এভরি পার্ট বৈশিষ্ট্য থেকে বস্তুর বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তার দারুণ একটি পথের সন্ধান মেলে। বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, বেশিরভাগ সময় মনে করা হয়েছে, একটি জিনিসকে বোঝার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে একে কেটে কেটে ছোট করা। মানে ব্যবচ্ছেদ করে উপাদানগুলো দেখার চেষ্টা করা। যেমনটা করা হয় ব্যাঙ, ইঁদুর বা পরমাণুকে বোঝার জন্যে।

কিন্তু হলোগ্রাম থেকে বোঝা যায়, মহাবিশ্বের সবকিছুকে এভাবে বোঝা যাবে না। হলোগ্রাফিক চিত্রকে ভেঙে ভেঙে বুঝতে গেলে আমরা এর উপাদান খুঁজে পাব না। পাব আগের চেয়ে ছোট পূর্ণ অংশই। এর মাধ্যমে অ্যাসপের আবিষ্কারকে বোম অন্যভাবে ভাবার সুযোগ পেলেন। বোমের বিশ্বাস, অতিপারমাণবিক কণারা দূরে চলে গেলেও যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে তার কারণ এ নয় যে তারা সামনে-পেছনে রহস্যময় কোনো সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। বরং তাদেরকে আলাদা কণা মনে হওয়াটাই একটা বিভ্রম। তাঁর মতে, বাস্তবতার আরও গভীর কোনো স্তরে এই কণাগুলো স্বতন্ত্র কোনো সত্ত্বা নয়। বরং একই মৌলিক জিনিসের বহিঃপ্রকাশ।

বোমের কথাটা আরও ভাল করে বুঝতে একটি উদাহরণ দেখি। মনে করুন, একটি অ্যাকুয়ারিয়ামে একটি মাছ আছে। আপনি অ্যাকুয়ারিয়ামটি সরাসরি দেখছেন না। এতে কী আছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন দুটি টেলিভিশন ক্যামেরার মাধ্যমে। একটি ক্যামেরা আছে অ্যাকুয়ারিমের সামনের দিকে আর আরেকটি আছে এক পাশে।

টেলিভিশনের স্ক্রিনে তাকালে দুটো মনিটরের মাছকে আলাদা মনে হবে। দুই ক্যামেরার দিকও তো আছে ভিন্ন দিকেই।ফলে ছবি দুটিও কিছুটা আলাদা হবে। তবে অনেকক্ষণ ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখবেন, দুই ছবির মধ্যে কোঠায় যেন একটা সম্পর্ক আছে। একটি মাছ যখন ঘোরে, অন্য মাছটিও সামান্য ভিন্ন রকম মোড় নেয়। একটি পাশে ঘুরলে আরেকটি সামনের দিকে মোড় নেয়। আসল বিষয় (মাছ আছে একটিই) না জানলে আপনি হয়ত ভাববেন, দুটো মাছ তাৎক্ষণিকভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করছে। কিন্তু আসলে তো তা নয়।

বোমের মতে অ্যাসপের পরীক্ষায় কণাদের মধ্যে ঠিক এটাই ঘটেছে। আপাত দৃষ্টিতে আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলা এই যোগাযোগ হয়ত আমাদের বলছে বাস্তবতার আরও গভীর একটি স্তর আছে। আমাদের নিজেদের মাত্রার বাইরের আরও কোনো মাত্রা থেকে হয়ত আমরা গোপন নেই। ঠিক যেমন অ্যাকুয়ারিয়ামের মতো। তাঁর মতে আমরা অতিপারমাণবিক কণাদেরকে আলাদা কণা হিসেবে দেখি, কারণ তারা আসলে বাস্তবতার একটি অংশমাত্র। পুরোটা নয়।

কণাগুলো আসলে আলাদা আলাদা অংশ নয়। আরও গভীর ও ভেতরের একটি একক। এরাও হলোগ্রাফিক ফুলের মতোই। আর মহাবিশ্ব যেহেতু এই জিনিসগুলো দিয়েই তৈরি, তাই মহাবিশ্বটা নিজেও একটি হলোগ্রাম। এটা ছাড়াও মহাবিশ্বের আরও কিছু ভূতুড়ে বৈশিষ্ট্যও আছে। বিভিন্ন কণাদের আলাদা থাকার বিষয়টি যদি বিভ্রম হয়ে থাকে তাহলে বাস্তবতার গভীর স্তরে সবকিছুই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। মানুষের মস্তিষ্কের কার্বন পরমাণুর ইলেকট্রনের সাথে সম্পর্ক আছে সমুদ্রে বিচরণ করা মাছের অতিপারমাণবিক কণার। সম্পর্ক আছে গাছের সাথে। নক্ষত্রের সাথে।

সবকিছুই সবকিছুকে স্পর্শ আছে। আমরা মানুষরা মহাবিশ্বের সব জিনিসকে বিভক্ত করতে চাই। বিভাগ অনুসারে সাজাতে চাই। কিন্তু এই কাজগুলো আসলে কৃত্রিম। পুরো জগতটা অখণ্ডনীয় এক জালের মধ্যে গাঁথা আছে। হলোগ্রাফিক মহাবিশ্বে স্থান ও কালকেও মৌলিকভাবে বিচার করা সম্ভব নয়। যেখানে কোনোকিছুই অন্য কিছু থেকে আলাদা নয় সেখানে অবস্থানের ধারণাই তো অকার্যকর।

গভীর স্তরে বাস্তবতাও এক ধরনের সুপারহলোগ্রাম। যেখানে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একসাথে বিদ্যমান। হয়ত একদিন সুপারহ্লোগ্রাফিক স্তরে পৌঁছে গিয়ে অতীতের দৃশ্যগুলোকে তুলে আনা যাবে। কিংবা ভবিষ্যতেরও?

সুপারহলোগ্রামে কী আছে সেটা একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন। ধরা যাক, সুপারহলোগ্রাম থেকেই মহাবিশ্বের জন্ম। যত রকম অতিপারমাণবিক কণা আছে বা হবে সবগুলোই এতে আছে। সবধরনের বস্তু ও শক্তির বিন্যাস আছে এতে। তার মানে এটি সকল কিছু এক মহাজাগতিক সংগ্রহশালা।

বোম স্বীকার করছেন, সুপারহলোগ্রামে কী লুকানো আছে তা জানার সুযোগ নেই। কিন্তু এটাও বলা যাবে না, কিছুই লুকানো নেই। তাঁর মতে, আবার এও হতে পারে, বাস্তবতার সুপাহলোগ্রাফিক স্তর আসলে এক নিছক মঞ্চবিশেষ। যার ভেতরে অসীমসংখ্যক আরও পর্যায়। এই ধারণা বোমের একার নয় কিন্তু। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্নায়ুশারীরবিদ কার্ল প্রিব্রামও মনে করছেন, আমাদের বাস্তবতা হলোগ্রাফিক হতে পারে।

মস্তিষ্কের স্মৃতির ধরে রাখার কৌশল নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রিব্রাম হলোগ্রাফিক ধারণা পেয়েছেন। বহু যুগের গবেষণায় দেখা গেছে, মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় না থেকে স্মৃতি ছড়িয়ে থাকে পুরো মস্তিষ্কজুড়ে। ১৯২০ এর দশকে কার্ল ল্যাশলি এ নিয়ে অনেকগুলো পরীক্ষা চালান। ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে তিনি দেখেন, এর মস্তিষ্কের যে অংশই বিচ্ছিন্ন করা হয়, এটি সার্জারির আগে শেখা জটিল কাজ করতে মনে রাখতে পারে। মস্তিষ্কের এই *প্রতি অংশে পূর্ণ* বৈশিষ্ট্যের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না।

পরে ১৯৬০ সালে প্রিব্রাম হলোগ্রাফি সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি পেয়ে গেলেন কাঙ্খিত ব্যাখ্যা। প্রিব্রামের বিশ্বাস, স্মৃতির সঙ্কেত নিউরন বা নিউরনের ছোট ছোট গুচ্ছে আবদ্ধ নয়। এটি বরং আছে স্নায়ুর সঙ্কেতের বিন্যাস আকারে। যা পুরো মস্তিষ্কে এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে আছে। ঠিক যেভাবে লেজার আলোর ব্যতিচার নকশা হলোগ্রাফিক ছবি ধারণা করা এক খণ্ড ফিল্মের পুরোটা জুড়ে বিস্তৃত থাকে। তাই প্রিব্রামের বিশ্বাস, মস্তিষ্কটাই একটি হলোগ্রাম।

প্রিব্রামের মত মেনে নিলে দারুণ একটি জিনিস সহজে ব্যাখ্যা করা যায়: মস্তিষ্ক এত অল্প জায়গায় কীভাবে এত সুবিশাল তথ্য সংরক্ষণ করে। হিসাব করে দেখা গেছে, গড়ে পুরো আয়ুষ্কালে মানুষের মস্তিষ্ক অন্তত এক হাজার কোটি বিট তথ্য ধারণ করতে পারে। মানে পাঁচ সেট এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার সমপরিমাণ তথ্য।

ঠিক একইভাবে দেখা গেছে, হলোগ্রামও ব্যাপক পরিমাণ তথ্য ধারণ করতে পারে। একটি ফটোগ্রাফিক ফিল্মে পতিত আলোর কোণ পরিবর্তন করে একই পৃষ্ঠে বহু আলাদা চিত্র সংরক্ষণ করা যাবে। দেখা গেছে, এক ঘন সেন্টিমিটার পরিমাণ ফিল্মেই এক কোটি তথ্য রাখা যাবে। মস্তিষ্কের বিশাল ভাণ্ডার থেকে আমরা কীভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে আসতে পারি তাও হলোগ্রাফিক নীতি থেকে সহজে বোঝা যায়। আপনার বন্ধু যদি জিজ্ঞেস করে, জেব্রা শব্দটি শুনলে আপনার মাথায় কী আসে? উত্তর দিতে আপনাকে ফাইলের পর ফাইল খুঁজে বেড়াতে হবে না। *ডোরাকাটা*, *ঘোড়ার মতো দেখতে*, *আফ্রিকান জাতক* ইত্যাদি কথাগুলো মুহূর্তের মধ্যে আপনার মাথায় চলে আসবে।

মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়ার একটি দারুণ ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিটি তথ্য অন্য তথ্যের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত। এটাও হলোগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য। হলোগ্রামের প্রতিটি অংশ অসীমভাবে অন্য অংশগুলোর সাথে জড়িত।

মস্তিষ্কের স্মৃতি ধারণই একমাত্র বিষয় নয় যেটাকে প্রিব্রামের হলোগ্রাফিক মডেল দিয়ে সহজে বোঝা যায়। স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক কীভাবে বিপুল পরিমাণ কম্পাঙ্ককে (আলো, শব্দ ইত্যাদির) রূপান্তর করে সেটাও বোঝা যায়। যার মাধ্যমে অনুভবযোগ্য জগতের অনভূতি আমরা লাভ করি। কম্পাঙ্কের এনকোডিং (বস্তুকে সঙ্কেতে আবদ্ধ করা) ও ডিকোডিংয়ের (মূল বস্তুর চিত্র ফিরিয়ে দেওয়া) কাজ হলোগ্রাম সবচেয়ে ভাল পারে। ঠিক যেভাবে হলোগ্রাম এক ধরনের লেন্সের মতো কাজ করে, অনুবাদ যন্ত্র যেভাবে দেখতে অর্থহীন এক গুচ্ছ কম্পাঙ্ককে একটি চিত্রে পরিণত করে, প্রিব্রামের মতে মস্তিষ্ক তেমনি লেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সঙ্কেতকে গাণিতিকভাবে আমাদের উপলব্ধিতে রূপ দান করে।

অনেকগুলো জোরালো প্রমাণ বলছে, মস্তিষ্ক কাজ করে হলোগ্রাফিক নীতি মেনেই। তাই স্নায়ুশারীরবিদরা প্রিব্রামের তত্ত্বকে ব্যাপক সমর্থন দিয়েছেন। আরেজিন্টাইন-ইতালীয় গবেষক হুগো জুকারেয়ি সম্প্রতি হলোগ্রাফিক মডেলকে আরেকটু বিস্তৃত করেছেন। একে নিয়ে এসেছেন শব্দ বিষয় বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যায়। মাথা না নাড়িয়েই মানুষ শব্দের উৎস শনাক্ত করতে পারে। মাত্র একটি কান সচল থাকলেও সেটা সম্ভব। এটা এক বড় রহস্য। জুকারেয়ি আবিষ্কার করেন, এটাও হলোগ্রাফিক মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। জুকারেয়ি হলোফোনিক সাউন্ড নামে এক প্রযুক্তিও আবিষ্কার করেছেন, যার মাধ্যমে শব্দকে দারুণ বাস্তব করে পুন:সৃষ্টি করা যায়।

আমদের ব্রেইন কম্পাঙ্কের ইনপুটের ওপর নির্ভর করে গাণিতিকভাবে জড় বাস্তবতা তৈরি করে—এ কথার পক্ষে ব্যাপক পরীক্ষামূলক প্রমাণও আছে। দেখা গেছে, আগে যেমনটা ভাবা হত তার চেয়ে অনেক বেশি কম্পাঙ্কের প্রতি আমাদের ব্রেইন সংবেদনশীল। গবেষকরা দেখেছেন, আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়ও শব্দ কম্পাঙ্কের প্রতি সংবেদনশীল। আমাদের ঘ্রাণ স্নায়ু বর্তমানে মহাজাগতিক কম্পাঙ্ক নামে পরিচিত সঙ্কেতের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি আমাদের দেহের কোষগুলো অনেক বিস্তৃত পরিসরের কম্পাঙ্কের প্রতি সংবেদনশীল। ফলে মনে হচ্ছে, আমাদের চেতনার হলোগ্রাফিক ক্ষেত্রেই এই কম্পাঙ্কগুলো বিভক্ত হয়ে উপলব্ধির জন্ম দেয়।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে প্রিব্রামের হলোগ্রাফিক মডেলকে বোমের তত্ত্বের সাথে মেলালে। যদি মহাবিশ্বের উপস্থিতি একটি গৌণ বাস্তবতা হয়ে থাকে, যা কিছু আছে সব যদি কম্পাঙ্কের হলোগ্রাফিক প্রলেপ হয়ে থাকে, মস্তিষ্কও যদি হলোগ্রাম হয়ে থাকে, মস্তিষ্ক যদি হলোগ্রাফিক প্রলেপ থেকে অল্প কিছু কম্পাঙ্ক বাছাই করে সেটাকে গাণিতিকভাবে স্নায়ুবিক উপলব্ধিতে রূপদান করে থাকে তাহলে সত্যিকার বাস্তবতা আসলে কী?

রাখঢাক করে বললে বলতে হয়, সত্যিকার বাস্তবতা বলতে কিছু থাকে না। প্রাচ্যের অনেকগুলো ধর্ম যেমনটা বলছে, বাস্তবতা আসলে নিছক এক মায়া বা ভ্রম। যদিও আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আমরা জড় পৃথিবীর কাঠামোসম্পন্ন প্রাণী, আসলে সেটাও এক মায়া।

আসলে আমরা কম্পাঙ্কের এক সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো গ্রাহক মাত্র। এই সমুদ্র থেকে আমরা যা গ্রহণ করি এবং ভৌত বাস্তবতায় রূপান্তর করি তা সুপারহলোগ্রামের অনেকগুলো পথের একটি পথ মাত্র। অনেক গবেষণকই মনে করছেন, বিজ্ঞান বাস্তবতার যত রূপ তৈরি করতে পেরেছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে নিখুঁত। অনেক গবেষক তো বলছেন, এর মাধ্যমে বহু আদিভৌতিক ব্যাপারও ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

যে মহাবিশ্বে এক একটি মস্তিষ্ক বড় এক হলোগ্রামের এক একটি অবিভাজ্য অংশ ও একে অপরের সাথে অসীমসংখ্যক পথে যুক্ত, সেখানে হলোগ্রাফিক স্তরের যোগাযোগের মাধ্যম হবে হয়ত টেলিপ্যাথি (কোনো প্রকার ইন্দ্রিয় ছাড়া যোগাযোগ)। একটি তথ্য এক মন থেকে কীভাবে বহু দূরের আরেক মনে চলে যায় সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়। মনোবিজ্ঞানের অনেকগুলো ধাঁধারও সমাধান হয়। যেমন চেক স্নায়ুবিদ স্ট্যানিস্লাভ গ্রফ ম্যান করেন, হলোগ্রাফিক মডেলের মাধ্যমে মানুষের চেতনার পরিবর্তিত অবস্থার অনেকগুলো আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়।

জড় মহাবিশ্বে আমাদের বিশ্বাসটা পাল্টে ফেলা অবশ্যই কঠিন। অবশ্য কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও আপেক্ষিকতার বেশিরভাগ কথাই তো আমাদের কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকে। সেই হিসেবে হলোগ্রাফিক নীতি অসম্ভব অদ্ভুত নয়।

অন্যভাবে চিন্তা করলে বলা যায় মহাবিশ্বটা আসলে একটি কম্পিউটার সিমুলেশন। অথবা সম্পূর্ণ গাণিতিক কাঠামো। কথাগুলো নিছক কল্পনা নয়। আছে জোরালো ভিত্তিও। ম্যাক্স টেগমার্ক *আওয়ার ম্যাথেম্যাটিক্যাল ইউনিভার্স* বইয়ে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছেন, আমাদের মহাবিশ্বটা নিছক গাণিতিক নয়, এটা নিজেই গণিত। আবার আমরা *দ্যম্যাট্রিক্স, দ্য থার্টিন্থ ফ্লোর, সোর্স কোড* মুভিগুলোর মতো কোনো সিমুলেশনে (কৃত্রিম বাস্তবতা) বাস করছি না বলারও কোনো জো নেই। বরং কম্পিউটার বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ভিডিও গেমসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল বাস্তবতার প্রয়োগ দেখে দেখে সেই ধারণাগুলোই বেশি বাস্তব মনে হচ্ছে। এর সাথে আমাদের নভেম্বর ২০১৯ সংখ্যায় “আপনি আসলে কে” লেখাটিকে মেলালে বাস্তব মহাবিশ্বের সাথে মন ও মগজের সম্পর্ক নিয়ে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে।

সূত্র: ইলিনয় ডট এজু, লাইভসায়েন্স ডট কম, রেন্স ডট কম, *আওয়ার ম্যাথেম্যাটিক্যাল ইউনিভার্স/*ম্যাক্স টেগমার্ক

লেখক: প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ

* https://www.livescience.com/objective-reality-not-exist-quantum-physicists.html
* <https://www.quora.com/Does-quantum-entanglement-violate-special-relativity>
* https://rense.com/general69/holoff.htm
* https://www.youtube.com/watch?v=knHf\_QphXyY
* <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/spains-hologram-protest-thousands-join-virtual-march-in-madrid-against-new-gag-law-10170650.html>
* <https://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=1926&t=how-holograms-are-made>

অসীম ও মহাবিশ্ব

কিছু দিন আগে বিজ্ঞানের একটি পাঠ্যবইয়ে দেখলাম লেখা আছে,***মহাবিশ্ব একই সাথে অসীম এবং প্রসারণশীল অর্থাৎ, প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে****।* কথাটা একটু বিভ্রান্তিকর। প্রথম কথা হলো, মহাবিশ্ব আদৌ অসীম কিনা তা নিশ্চিত করে কেউ জানে না। আবার প্রশ্ন দাঁড়ায়, মহাবিশ্ব যদি অসীম হয়, তার প্রসারণ কেমন হবে বা তার তাৎপর্যই বা কী হবে? অসীম জিনিস আরও বড় হলে তার নাম কী হবে? কেউ হয়ত বলবেন, আর বড় অসীম হবে।

গণিত বলছে, অসীমের সাথে ১ যোগ করলেও অসীমই হয়। আরও বড় সংখ্যা, এমনকি অসীম যোগ করলেও অসীম অসীম অসীমই থাকে। অসীম আসলেই এক গোলমেলে জিনিস। পদার্থবিদ বলুন কিংবা গণিতবিদ, অসীম থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই যেন মঙ্গল (সবসময় অবশ্য নয়!)। এই যে ধরুন জোড় সংখ্যা আর বিজোড় সংখ্যাদের কথাই। কোন সংখ্যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে পারবেন? হয়তো মনে হবে যেহেতু বিজোড় সংখ্যা আগে আসে, তাই বিজোড় সংখ্যাই বেশি। অবশ্য শূন্যকে জোড় ধরে নিলে তো বিতর্ক এখানেই খতম। আর অকাট্য গাণিতিক যুক্তি তা বলেও। কিন্তু সেটা নাহয় ছাড় দিলাম। ২ থেকেই জোড় করুন না। এবার আপনি কি এমন কোনো বিজোড় সংখ্যা বলতে পারবেন যার বিপরীতে আলাদা কোনো জোড় সংখ্যা পাওয়া যাবে না?

এটা তো সহজ ভাবনাই ছিল। আরেকটু জটিল করে ভাবি। ১, ২, ৩, … সংখ্যাগুলোকে আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা বলি। আর এগুলোর বর্গ, মানে ১, ৪, ৯, ... ইত্যাদিকে বলি বর্গ সংখ্যা। এবার ভাবুন তো স্বাভাবিক সংখ্যা বেশি, নাকি বর্গ সংখ্যা? এভাবে চিন্তা করা যায়: ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত চিন্তা করলে স্বাভাবিক সংখ্যা পাব ১০০ খানা। আর বর্গ সংখ্যা মাত্র ৯টি। বর্গ সংখ্যারা পিছিয়ে আছে। কিন্তু আসলেই কি তাই? আগের মতোই ভাবা যাক না।

এমন কোনো আলাদা স্বাভাবিক সংখ্যা পাওয়া যাবে কি, যার বিপরীতে আলাদা কোন বর্গ সংখ্যা পাওয়া যাবে না? নীচের সারণিটা একটু দেখা যেতে পারে।

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| স্বাভাবিক সংখ্যা | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ... |
| বর্গ সংখ্যা | ১ | ৪ | ৯ | ১৬ | ২৫ | ... |

প্রতিটি স্বাভাবিক সংখ্যার বিপরীতেই একটি করে স্বতন্ত্র বর্গ সংখ্যা পাওয়া যাবেই। তাহলে স্বাভাবিক সংখ্যারা বেশি আছে বলা যাবে কি? এই সমস্যাটিকে বলা হয় গ্যালিলিও প্যারাডক্স। গ্যালিলিও তাঁর *টু নিউ সায়েন্সেস* বইয়ে বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। শেষে গ্যালিলিও বলেছিলেন, বড়, সমান বা ছোট এই কথাগুলো শুধু সসীম জিনিসের জন্যেই খাটে। অসীম সেটের জন্যে নয়। অবশ্য ঊনবিংশ শতকের জর্জ ক্যান্টর দেখিয়েছিলেন, বিভিন্ন রকম অসীম থাকতেও পারে। তবে অসীম নিয়ে জটিলতা কিন্তু কেটে যায়নি।

গণনাযোগ্য অসীম বলে একটি কথা আছে। যে অসীম সেটকে স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে এক-এক করে দাঁড় করানো যাবে তাদেরকে বলা হয় গণনাযোগ্য অসীম। বর্গ সংখ্যাগুলোও অসীম। বর্গ সংখ্যার পরিমাণ অসীম হলেও সসীম সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক বর্গ সংখ্যা পর্যন্ত গুণে আসা যাবে। সবগুলো বর্গ সংখ্যা বলতে হলে অসীম সময় লাগবে ঠিকই। কিন্তু যদি বলা হয় ১৫২১ বর্গ সংখ্যাটি পর্যন্ত (বা অন্য যে কোনো বর্গ সংখ্যা) সংখ্যাগুলো বলুন, তাহলে কিন্তু কাজটি করা যাবে।

আবার হিলবার্টের প্যারাডক্সের কথাই ভাবুন। ধরুন, একটি হোটেলে গণনাযোগ্য অসীম সংখ্যক কক্ষ আছে। আরও ধরুন, বর্তমানে সবগুলো কক্ষে অতিথি আছেন। এবার নতুন আরেকজন অতিথি আসলে কী হবে? তিনি কি এই হোটেলে আশ্রয় পাবেন?

পাবেন আসলে। কীভাবে সেটা? যেহেতু হোটেলে গণনাযোগ্য অসীম সংখ্যক কক্ষ আছে, তাই আমরা ১ম কক্ষের অতিথিকে ২য় কক্ষে নিয়ে যাব। ২য় কক্ষের অতিথিকে ৩য় কক্ষে। এভাবে nতম কক্ষের অতিথিকে নিয়ে রাখব n+1তম কক্ষে। বিষয়টি মানতে কষ্ট হলে ওপরের ণনাযোগ্য অসীমের বৈশিষ্ট্যে আবার একটু চোখ বুলিয়ে নিন। এভাবে ঐ হোটেলে যে-কোনো সসীম কিংবা অসীম সংখ্যক নতুন অতিথিকে রাখা যাবে।

গণিতে অসীম বোঝানোর জন্য একটি প্রতীক (∞) ব্যবহার করা হয় ঠিকই। কিন্তু তবুও অসীম কিন্তু সত্যিকার অর্থে সংখ্যার মর্যাদা পায়নি। দিতে গেলে মস্ত বড় গণ্ডগোল লেগে যেতে পারে। যেমন, অসীমের সাথে ১ যোগ করলেও অসীম হয়, আবার ২ যোগ করলেও অসীম হয়। তাহলে কি ১ আর ২ সমান? সমস্যাটা ১ আর ২-এ নয়। অসীমকে সবসময় সংখ্যা মনে করতে গেলেই সমস্যা। এজন্যে অসীম আসলে যতটা না সংখ্যা, তার চেয়ে বেশি হলো ধারণা। তাইতো অসীমকে বাস্তব সংখ্যা (R) বলা হয় না।

অসীমকে মহাবিশ্বের সাথে মেলাতে গেলে গোলমালটা দ্বিগুণ হয়। আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না মহাবিশ্ব কত বড়। মহাবিশ্ব অসীম হলে এর আকার নিয়ে আর ভাবার তেমন কিছু নেই। তবে অসীম না হলে মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট আকার থাকবে। কিন্তু গোলমালটা হলো আমরা কখনোই পুরো মহাবিশ্বকে দেখতে পাব না। হ্যাঁ, মহাবিশ্ব সসীম হলেও পারব না। কারণ হলো মহাবিশ্বের প্রসারণ। আর আলোর বেগের সামান্যতা। হ্যাঁ, বুঝে-শুনেই আলোর বেগকে সামান্য বললাম। যদিও সে বেগ সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার। তাহলে কীভাবে কম হল সে বেগ?

মহাবিশ্বের জন্ম আজ থেকে প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগে। সেই থেকে প্রসারিত হচ্ছে। জন্মের ১০-৩৬ সেকেন্ড পরে তো প্রসারণটা ছিল মারাত্মক। সে প্রসারণ স্থায়ী হয়েছিল জন্মের মাত্র ১০-৩২ সেকেন্ড পর পর্যন্ত। সময়টার নাম স্ফীতি যুগ। ঐ সামান্যটুকু সময়েই মহাবিশ্বের সাইজ ১০২৬ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। অন্যভাবে বললে, প্রোটনের চেয়ে ছোট একটি বস্তু তরমুজের সমান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। এখনও প্রসারিত হয়ে চলেছে মহাবিশ্ব। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে প্রসারণের হার বাড়ছে।

এবার আরেকটু ভাবি। মহাবিশ্বের জন্ম ১৩৮০ কোটি বছর আগে- এ কথার অর্থ কী? অর্থ হলো জন্মের পর মহাবিশ্বের দূরতম অঞ্চল থেকে আমাদের কাছে আলো এসে পৌঁছানোর জন্যে সময় পেয়েছে ১৩৮০ কোটি বছর। তার মানে ১৩৮০ কোটি আলোকবর্ষের বেশি দূরের বস্তু আমরা দেখতে পারব না। তার মানে, পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বিবেচনা করলে প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া যায় পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের ব্যাস প্রায় ২৮০০ আলোকবর্ষ।

এটারও আরও গুরুত্বপুর্ণ তাৎপর্য অন্যখানে। মহাবিশ্বের আকার যদি ১৩৮০ কোটি আলোকবর্ষের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সেই দূরত্বের চেয়ে দূরের কোনো বস্তু আমরা কখনও দেখব না। কারণ, সেখান থেকে কোনোদিনই আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে না। সসীম মহাবিশ্বকেও পুরোটা দেখতে না পারার জন্যে এই কারণটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আরও বড় কারণও রয়েছে।

একটু আগে আমরা বললাম, পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের প্রাথমিক আকার ২৮০০ আলোকবর্ষ হতে পারে। আসলে কিন্তু আরও বেশি। কারণ ওই যে মহাবিশ্বের প্রসারণ। আমরা যে আগে ব্যসার্ধ বলেছিলাম ১৩৮০ আলোকবর্ষ, প্রসারণের কারণে সেই ব্যসার্ধ এখন ফুলে ফেঁপে হয়েছে আরও বেশি । বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন প্রসারণের কারণে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের বর্তমান ব্যাসার্ধ হবে ৪৭৫০ কোটি আলোকবর্ষ। তার মানে পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব হবে ‘অন্তত’ ৯৩০০ আলোকবর্ষ। তার মানে শুধু পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বেরই এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় ১০ হাজার কোটি বছর। সময় যত গড়াবে, সেই দূরের প্রান্তটি আরও দূরে সরতে থাকবে। ফলে সেই প্রান্তকে আর কখনও দেখা হবে না আমাদের। কারণ সেটা দেখতে হলে আলোর বেগকে আমাদের চোখে এসে পৌঁছতে হবে। কিন্তু আলোর বেগ যে অত্যন্ত সামান্য! ফলে মহাবিশ্বের একটি অংশ সবসময় আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরেই থেকে যাবে।

এখানে একটি কথা বলে না রাখলেই নয়। পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের কেন্দ্র কিন্তু আমরা পৃথিবীকে ধরেছি । কিন্তু এর মানে এই নয় যে মহাবিশ্বেরও কেন্দ্র পৃথিবী। মোটেও তা নয়। আসলে মহাবিশ্বের নির্দিষ্ট কোনো কেন্দ্রই নেই। সেটার কারণ আপাতত আলোচনার সুযোগ নেই। আমরা মূল কথায় ফিরে যাই।

এ তো গেল মহাবিশ্ব সসীম হলে তার কথা। কিন্তু অসীম হলে? আগেই বলেছি, ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। তবুও একটু ভাবার চেষ্টা করি। এক ঘন মিটারের একটি স্থানের কথা ভাবুন। এখানে অবশ্যই সসীম সংখ্যক সম্ভাব্য কণা থাকতে পারে। জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেল নাম্বারফাইলের টনি প্যাডিলা হিসেবে করে দেখেছেন কণার সংখ্যা হয় । কণার সংখ্যা অসীম হওয়া সম্ভব নয়। কেননা প্রতিটি কণারই থাকবে নিজস্ব স্পিন বা ঘূর্ণন, চার্জ, অবস্থান, বেগ ইত্যাদি। এসব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে অসীম পরিমাণ কণা থাকা সম্ভব নয়। কথাটাকে আরও সহজ করে বললে হয়, মহাবিশ্বে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী কণার সংখ্যা অসীম হওয়া সম্ভব নয়।

এটাও ঠিক যে মহাবিশ্বে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী কণার সম্ভাব্য পরিমাণটা এত বিশাল যে মহাবিশ্বের সবগুলো পেন্সিল দিয়েও সংখ্যাটাই লিখে শেষ করা যাবে না। সে তুলনায় পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে কণার সংখ্যা মাত্র । তার মানে, মাত্র ১ ঘন মিটার আয়তনের মধ্যেই ঢের বেশি পরিমাণ স্বতন্ত্র কণাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু! কিন্তু মহাবিশ্ব অসীম হলে?

কী হবে ভাবার আগে মাথায় রাখুন, মহাবিশ্বে সম্ভাব্য স্বতন্ত্র কণার সংখ্যা অনেক বেশি হলেও সংখ্যাটা সসীম। কিন্তু অসীম মহাবিশ্বে এত বড় সংখ্যারও কোনো বাহাদুরি নেই। ফলে, আপনি পৃথিবী থেকে ভ্রমণ করে দূরে যেতে থাকলে এক সময় সম্ভাব্য সব কণার বিন্যাস শেষ হয়ে যাবে। ফলে একসময় আপনি আগের কণার একই রকম বিন্যাস দেখা শুরু করবেন। তার মানে এক সময় আপনি ঠিক আপনারই মতো একজন মানুষকে পেয়ে যাবেন। আপনার প্রিয় পোষা প্রাণীটার মতো আরেকটা প্রাণীও খুঁজে পাবেন। অবিকল নকল জিনিস এভাবে পেতে থাকবে। যত সামনে যাবেন, তত এমন নকল জিনিস আসতে থাকবে।

আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আপনি যত সামনে যাবেন তত নকলের আকার বড় হবে। নকল পাড়া-মহল্লা, শহর, দেশ থেকে পেতে পেতে একসময় আপনি পুরো মহাবিশ্বের নকল আরেকটা মহাবিশ্বই পেয়ে যাবেন।। সেটা পাওয়ার জন্য মাল্টিভার্স তত্ত্বও লাগবে না। এগুলো হবে আমাদের মহাবিশ্বের মধ্যেই নকল মহাবিশ্ব।

আর প্রসারণ? তাত্ব্বিকভাবে অসীম বস্তুরও প্রসারণ থাকতে পারে। কিন্তু ঐ যে বললাম, অসীম একটা গোলমেলে বস্তু। অসীম বস্তু প্রসারিত হলেও আগের চেয়ে বড় হবে না। কারণ আগেও অসীম ছিল, আর এখন যা হয়েছে সেটাও অসীম। অসীম যে সংখ্যা হতে পারে না, সেটারও আরেকটা বাস্তব উদাহরণ দেখা গেল।

তবে আসলেই মহাবিশ্ব অসীম না সসীম সেটা এখনই নিশ্চিত করে বলার কোনো সুযোগ নেই।

সূত্র: স্পেস ডট কম, ডিসকভারি ম্যাগাজিন, ম্যাথইনসাইট ডট অর্গ, ফিজ ডট অর্গ, মিডিয়াম ডট কম ও বই হিডেন রিয়েলিটি/ ব্রায়ান গ্রিন।

* <https://math.stackexchange.com/questions/36289/is-infinity-a-number>
* <https://phys.org/news/2015-03-universe-finite-infinite.html>
* <https://www.physicsoftheuniverse.com/topics_bigbang_inflation.html>
* <https://medium.com/starts-with-a-bang/ask-ethan-is-the-universe-infinite-or-finite-ec032624dd61>
* <https://www.space.com/24073-how-big-is-the-universe.html>
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert%27s\_paradox\_of\_the\_Grand\_Hotel](https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert's_paradox_of_the_Grand_Hotel)
* <https://plus.maths.org/content/do-infinities-exist-nature-0>
* <https://www.discovermagazine.com/the-sciences/infinity-is-a-beautiful-concept-and-its-ruining-physics>
* <https://mathinsight.org/definition/countably_infinite>
* <https://medium.com/starts-with-a-bang/ask-ethan-how-large-is-the-entire-unobservable-universe-73adef0fd480>
* <https://physics.stackexchange.com/questions/139333/if-the-universe-is-infinite-should-there-be-a-duplicate-of-me-with-probability>

লেখক, প্রভাষক (পরিসংখ্যান), পাবনা ক্যাডেট কলেজ।

সম্ভাবনা তত্ত্ব, কোয়ান্টাম টানেলিং ও নক্ষত্রের দহন

আজ আলোচনা শুরু করব গুরুগম্ভীরভাবে। প্রথমেই সম্ভাবনা তত্ত্বের দুয়েকটা কথা। তারপর কোয়ান্টাম মেকানিকসের সাথে এর সম্পর্কের কথা। তারপর বলব সূর্যসহ সব নক্ষত্র কীভাবে টিকে আছে কোয়ান্টাম মেকানিকসের কল্যাণে।

মজার ব্যাপার হলো, আমরা সবসময় বলি, মহাবিশ্ব চলে চার প্রকার বল দিয়ে। এর মধ্যে তিনটি বল চলে কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্র মেনে। কাজ করে প্রামাণবিক জগতে। এরা হলো সবল ও দুর্বল নিউক্লিয় বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল। আর অপর বল মহাকর্ষ মেনে চলে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা। যে বল কাজ করে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ বা তারচেয়ে বড় আকারে বস্তুতে। মজার ব্যাপারটা হলো, নক্ষত্র, ছায়াপথদের অনেক কাজ কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্র ছাড়া অচল। নক্ষত্রদের আলো দেখে এদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি। সেই বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হত না, যদি না থাকত কোয়ান্টাম মেকানিকস।

সম্ভাবনা তত্ত্বের একেবারে প্রাথমিক নমুনা পাওয়া যায় আরব গণিতবিদ আল খলিলির বুক অব ক্রিপ্টোগ্রাফিক মেসেজ বইয়ে। তিনি স্বরবর্ণ ছাড়া ও সহ সব আরবি শব্দের বিন্যাস সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন। আল কিন্দি সূচনা করেছিলেন পরিসংখ্যানিক অনুমান, ক্রিপ্টোবিশ্লেষণ ও গণসংখ্যা বিশ্লেষণের। তবে আধুনিক সম্ভাবনা তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে ক্যাসিনোতে। জুয়াড়িদের হাত ধরে। জুয়া খেলায় হার-জিতের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে সম্ভাবনার চর্চার শুরু।

সম্ভাবনা তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ষোড়শ শতকের ইতালীয় গণিতবিদ (আসলে বহুবিদ) গেরোলামো কারদানো ও সপ্তদশ শতকের পিয়েরে ফার্মা ও ব্লেইজ প্যাসকেল। তত্ত্বটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক মাইলফলক বেইজের উপপাদ্য। একটি ঘটনা ঘটে গেলে তার ওপর নির্ভরশীল অন্য ঘটনার সম্ভাবনা বের করা যায় এ উপপাদ্য দিয়ে। থমাস বেইজ প্রথম যখন এটি প্রকাশ করেন, গুরুত্বটা কেউ বোঝেনি। কিন্তু আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা, মেশিন লার্নিং, মেডিক্যাল রিসার্চসহ বিজ্ঞানের বড় বড় অনেক শাখা টিকে আছে এরই কল্যাণে।

সম্ভাবনাকে বলা হয় অনিশ্চয়তা পরিমাপ করার উপায়। যখন নিশ্চিত করে বলা যায় না একটি ঘটনা ঘটবে কি ঘটবে না, তখনই চলে আসে সম্ভাবনা। সম্ভাবনানির্ভর ঘটনাকে বলে দৈব (random) ঘটনা। অনিশ্চয়তাকে পরিমাপ করার উপায় আছে কয়েকটি। ধরুন, একটি ঝুড়িতে ৩ টি কালো ও ২টি লাল বল আছে। তাহলে না দেখে একটি বল তুললে সেটি লাল হবার সম্ভাবনা ২/৫ বা ৪০% । কালো হবার সম্ভাবনা ৩/৫ বা ৬০%। একইভাবে একটি বিশুদ্ধ ছক্কার গুটি নিক্ষেপ করলে ১ উঠার সম্ভাবনা ১/৬। সম্ভাবনা পরিমাপ করার এ উপায়টিকে বলে সনাতন পদ্ধতি।

আরেকটি উপায় হলো প্রায়োগিক বা গণসংখ্যা পদ্ধতি। একে আসলে বলা যায় আরেকটু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ধরুন, আমরা জানতে চাই, একটি মুদ্রায় ভেজাল আছে কি না। মানে টস করলে হেড ও টেইল পড়ার সম্ভাবনা সমান কি না। বা নিছক জানতে চাই, কোনটা উঠার সম্ভাবনা কত। এটা জানতে হলে কয়েনটিকে অনেকবার টস করতে হবে। পরিসংখ্যানের একটি নিয়ম হলো, যত বেশি নমুনা নেওয়া হবে, সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে তত ভাল করে জানা যাবে। ধরুন, আমরা ১০০০ বার টস করে ৪৯০টি হেড ও ৫১০টি টেইল পেলাম। তাহলে আমরা বলতে পারি, এই কয়েনে হেড পড়ার সম্ভাবনা ০.৪৯ ও টেইল পড়ার সম্ভাবনা ০.৫১। বুঝতেই পারছেন, ৪৯০ ও ৫১০কে ১০০০ দিয়ে ভাগ দিয়ে পাওয়া যাবে এই সম্ভাবনা।

বিজ্ঞান ক্রমশ আগের চেয়ে ভাল ফল পেতে চায়। আগের চেয়ে বড় নমুনা নিয়ে কাজ করে। এভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে যায়। বিজ্ঞানের সাথে সম্ভাবনার এই ধারণাটির মিল এখানেই। ধরুন, আমরা কয়েনের হেড ও টেলের আরও নিখুঁত সম্ভাবনা জানতে চাই। তাহলে বাড়াতে হবে টসের সংখ্যা। ধরুন, ১০,০০০ বার টস হলো। এবারে হয়ত ৪৯২০ ও ৫০৮০ বার যথাক্রমে হেড ও টেইল পড়ল। তাহলে হেড ও টেলের নতুন সম্ভাবনা হবে যথাক্রমে ০.৪৯২ ও ০.৫০৮।

দুটি দলের মধ্যে খেলা কে জিতবে সেটা বের করার একটি সরল উপায়ও এটি। যেমন এ পর্যন্ত এল ক্লাসিকো ম্যাচ (বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচ) খেলা হয়েছে ২৭৭টি। দুটি দিলই জিতেছে ৯৬টি করে ম্যাচ। ড্র হয়েছে ৮৫টি ম্যাচ। তাহলে পরের ম্যাচে রিয়াল জিতবে তার সম্ভাবনা ৯৬/২৭৭ বা ০.৩৫ বা ৩৫ %। সমান সম্ভাবনা বার্সেলোনার। আর ড্র হবার সম্ভাবনা ৩০%। পরের ম্যাচের ফল হাতে আসার সাথে সাথেই কিন্তু এই সম্ভাবনাগুলো পাল্টে যাবে। মনে রাখতে হবে, এখানে যেটা বললাম, এটা কিন্তু সম্ভাবনা বের করার খুব সরল একটি উপায়।

সম্ভাবনার ব্যাখ্যাও নানান রকম হতে পারে। ধরুন, একটি রাস্তায় ট্রাক দূর্ঘটনার সম্ভাবনা ০.০১%। এর একটি ব্যাখ্যা হলো, এখানে প্রতি ১০০টি ট্রাক চলাচল করলে গড়ে একটি দূর্ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ দলের টেস্ট ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা ১০% হলে গড়ে প্রতি ১০ ম্যাচে একটি ম্যাচে জয় আসবে।

উচ্চতর পরিসংখ্যানে সম্ভাবনাকে বের করা হয় গাণিতিক ফাংশন দিয়ে। ফাংশন থেকে পাওয়া মানকে গ্রাফে বসিয়েও সহজে দেখা যায়। বিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে উলম্ব দাগ আর অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে কার্ভের ক্ষেত্রফল সম্ভাবনা প্রকাশ করে। কার্ভকে অনেক সময় তরঙ্গ বা তরঙ্গের অংশবিশেষ হিসেবে চিন্তা করা যায়।

চিত্র ১ ও ২: বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাস

~~পাশাপাশি বসাতে হবে~~

হুট করেই এই সম্ভাবনা ঢুকে পড়ে কোয়ান্টাম মেকানিকসের জগতে। নিউটনীয় বলবিদ্যা অনুসারে বস্তুর আদিবেগ ও বেগ বৃদ্ধির হার জানলে আমরা বলতে পারব নির্দিষ্ট সময় পরে বস্তুটি কোথায় থাকবে। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় নিশ্চিত করে বলা যায় না বস্তুকণাটি কত সময় পরে কোথায় চলে গেল। বস্তুর অবস্থান নির্ধারণ করে স্রডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ। একগুচ্ছ আলাদা আলাদা জায়গায় থাকার সম্ভাবনা পাওয়া যায় *বর্ন রুল* থেকে। এই রুল বা নিয়ম বলছে, প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গায় থাকার সম্ভাবনা পাওয়া যায় তরঙ্গ ফাংশন থেকে পাওয়া বিস্তারকে বর্গ করে।

কোয়ান্টাম মেকানিকসের আবির্ভাবের আগেই কণার সম্ভাবনাধর্মীতা টের পাওয়া গিয়েছিল ১৮০১ সালে থমাস ইয়ংয়ের দ্বি-চির পরীক্ষার মাধ্যমে।

একটা সরু দেয়ালের কথা কল্পনা করুন, যাতে দুটি সমান্তরাল ও সরু ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রদের ভেতর দিয়ে কণা নিক্ষেপ করলে কী হবে তা দেখার আগে চলুন দেখি আলো ফেললে কী হয়। দেয়ালের এক পাশে একটি নির্দিষ্ট রংয়ের এর আলো ফেলুন। আলোর রং নির্দিষ্ট হওয়ায় এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও নির্দিষ্ট। এখন বেশির ভাগ আলোই দেয়ালে বাধা পাবে। কিন্তু কিছু আলো ছিদ্র ভেদ করে ওপারে চলে যাবে। ধরুন যে দেয়ালের ওপারে, আলো থেকে উল্টো দিকে একটি পর্দা রেখে দিলেন। এই পর্দার যে কোনো বিন্দুতে দুই ছিদ্রের আলোই পৌঁছাবে। কিন্তু সে বিন্দুগুলোতে আলো পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দুটি আলাদা ছিদ্র দিয়ে যাওয়া আলোকে ভিন্ন পরিমাণ দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে। অতিক্রান্ত দূরত্ব ভিন্ন হওয়াতে দুই ছিদ্র দিয়ে যাওয়া তরঙ্গ দুইটি পর্দায় পৌঁছেও ভিন্ন দশায় থাকবে। কিছু জায়গায় এক তরঙ্গের খাঁজ অপর তরঙ্গের চূড়ার সাথে মিলে যাবে। এক্ষেত্রে দুটি তরঙ্গ একে অপরকে বিলীন করে করে দেবে। অন্য জায়গায় দুটি তরঙ্গের চূড়া ও খাঁজরা সমান তালে চলবে (একটির চূড়া অপরটির চূড়া বরাবর থাকবে)। এ কারণে তরঙ্গের শক্তি বেড়ে যাবে। তবে বেশিরভাগ জায়গায়ই এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি ঘটনা ঘটবে। এর ফল, আলো- আঁধারির কিছু বৈশিষ্ট্যময় নকশা চোখে পড়বে।

চিত্র ৩

দ্বি-চির পরীক্ষায় উপরের ও নিচের ছিদ্র দিয়ে পর্দার বিভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছা তরঙ্গের দূরত্ব ভিন্ন হওয়ায় কোথাও তরঙ্গ একে অপরেকে শক্তিশালী করে, আবার কোথাও একে অপরকে নাকচ করে দেয়। এই ব্যতিচারের ফলে তৈরি হয় একটি নকশা।

মজার ব্যাপার হল, আপনি যদি আলোক উৎসের বদলে কণা নিঃসারকও (যেখান থেকে নির্দিষ্ট গতিসম্পন্ন কণা যেমন ইলেকট্রন নির্গত হবে) ব্যবহার করেন, তবুও একই ধরনের নকশা পাওয়া যাবে। (কোয়ান্টাম থিওরি অনুসারে ইলেকট্রনকে যদি নির্দিষ্ট বেগ দেওয়া হয় তবে এর জড় তরঙ্গের নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকবে।) মনে করুন, আপনি একটি চির বন্ধ রেখে দেয়ালের দিকে ইলেকট্রন ছুঁড়ে দিলেন। বেশির ভাগ ইলেকট্রনকে দেয়াল থামিয়ে দেবে। কিন্তু কিছু ইলেকট্রন চির ভেদ করে ওপাশের পর্দায় পৌঁছবে। মনে হতে পারে যে দেয়ালে দ্বিতীয় আরেকটি চির খুলে দিলে পর্দার প্রতিটি বিন্দুতে আঘাত হানা ইলেকট্রনের সংখ্যা আরও বেশি হবে। কিন্তু আরেকটি চির খুলে দিলে দেখা যায়, কিছু বিন্দুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি, আবার কোনোটায় ইলেকট্রনের সংখ্যা খুব কম। মনে হচ্ছে যেন ইলেকট্রনের মধ্যেও আলোর মতোই ব্যতিচার হচ্ছে, যা তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য। কণার নয়।

**এবার কল্পনা করুন, চির দুটি দিয়ে একটি করে ইলেকট্রন প্রবাহিত করা হল। এবারেও কি ব্যতিচার ঘটবে**? **মনে হতে পারে, প্রতিটি ইলেকট্রন দুটি চিরের যে কোনো একটি দিয়ে পার হবে। ফলে ব্যতিচার ঘটার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে একটি করে ইলেকট্রন পাঠানো হলেও ব্যতিচারের নকশা দেখা যায়। তার মানে প্রতিটি ইলেকট্রন একই সাথে দুটো চির দিয়েই যাচ্ছে! ব্যতিচার ঘটাচ্ছে নিজের সাথেই।**

**দ্বি-চির পরীক্ষার মাধ্যমেই কণার অবস্থানের সাথে সম্ভাবনার যোগসূত্র পাওয়া যায়। ম্যাক্স বর্ন পরবর্তীতে সেটাকে তরঙ্গের বিস্তারের সাথে সম্পর্কে দেখিয়ে সূত্র প্রদান করেন। ৩ নং চিত্রে আলোর ব্যতিচারে সাদার পরিমাণ যত বেশি, সেখানে কণাটি থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। (ব্যতিচারের নকশাকে উপরের সম্ভাবনা বিন্যাসের কার্ভের সাথে মিলিয়ে দেখুন)।**

**এবার দেখা যাক কোয়ান্টাম মেকানিকসের সাথে সূর্যের আলোর কী সম্পর্ক। সূর্যসহ নক্ষত্রদের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনরা যুক্ত হয়ে আরও বড় পরমাণু হিলিয়াম তৈরি করে। এই প্রক্রিয়া চলার সময় কিছু ভর আলো ও তাপ আকারে অবমুক্ত হয়। এই আলো ও তাপ সূর্য থেকে বেরিয়ে আসতেই প্রয়োজন পড়ে কোয়ান্টাম মেকানিকসের অবিশ্বাস্য এক কৌশল।**

**ধরুন, একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি বল আছে। ধরি, বলটির গতিশক্তি ১০০ জুল। পাহাড়ের বিভব শক্তি ১০ জুল হলে বলটি সহজেই পাহাড়টি পার হয়ে যাবে। চিরায়ত গতিবিদ্যা অনুসারে গড়িয়ে দিলে বলটি পাহাড় পার হবে তার সম্ভাবনা ১০০%। কিন্তু পাহাড়ের উচ্চতা আরও বেশি হলে বিভব শক্তি বাড়বে। ধরুন ২০০ জুল হলো। এবার আর বলটি পাহাড় পার হতে পারবে না। সম্ভাবনা শূন্য। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিকসে বলের একটি তরঙ্গ ফাংশন আছে। ফলে তরঙ্গ আকারে বলটি পাহাড়ের অপর পাশে চলে যাওয়ার একটি অশূন্য সম্ভাবনা আছে। এই ঘটনারই নাম কোয়ান্টাম টানেলিং। গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে বিষয়টা আরও বেশি সহজে বোঝা যায়। তরঙ্গের সাথে সম্ভাবনা তত্ত্বকে মিলিয়ে চিন্তা করলেই এটা বোঝা যায়।**

**চিত্র ৪ ও ৫**

**অন্য একটি বাস্তব উদাহরণ চিন্তা করি। প্রোটন খুব স্থিতিশীল একটি কণা। এর গড় আয়ুর নিম্নসীমাই ১০^৩৩ বছর। তার মানে, এক বছরে একটি প্রোটন কণা ক্ষয় হবে তার সম্ভাবনা ১০**^(-৩৩)**। অনেক অনেক ছোট একটি সংখ্যা। অল্প কয়েকটি প্রোটন কণা বিবেচনা করলে কোনো প্রোটনকে ক্ষয় হতে দেখা যাবে না। তবে যথেষ্ট বেশি পরিমাণ প্রোটন নিয়ে পরীক্ষা চালালে বছরে কয়েকটি প্রোটন কণাকে ভাঙতে দেখা অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, উপরে উল্লিখিত সময়টি প্রোটনের গড় আয়ু। সব প্রোটনের আয়ু সমান নয়। সংক্ষিপ্ত কথা হলো**, **সম্ভাবনা অল্প হলেও বেশি জিনিস নিয়ে কাজ করলে অল্প সম্ভাবনার ঘটনাও ঘটতে পারে।**

সূর্যের কেন্দ্রে প্রতি সেকেন্ডে ৪ × ১০^৩৮ টি প্রোটন (হাইড্রোজেন) কণা মিলিত হয়ে হিলিয়াম তৈরি করে। প্রতিটি প্রোটন সেকেন্ডে প্রায় ৫০০ কিমি. বেগে ছোটাছুটি করে। সূর্যের কেন্দ্রে ঘনত্ব কিন্তু অনেক বেশি। সোনার ঘনত্বের প্রায় ১০ গুণ। ফলে প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষ ঘটে হরহামেশা। প্রতি সেকেন্ডেই বিলিয়ন বিলিয়ন সংঘর্ষ ঘটে। ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটনরা যুক্ত হয়ে হিলিয়াম তৈরি করে আলো ও তাপ তৈরির জন্য অল্প কিছু প্রোটনরা মিলিত হলেই যথেষ্ট। সূর্যে প্রায় ১০^৫৭ টি প্রোটন আছে। এর মধ্যে প্রতি ১০^২৮টির একটি অন্য একটির সাথে মিললেই হয়।

কিন্তু প্রোটনের বেগের বিপরীত আছে আরেকটি নিয়ামক। প্রোটন একটি (ধনাত্মক) চার্জধারী কণা। ফলে কণাগুলো একে অন্যকে করে বিকর্ষণ। তাহলে হিসেব করে দেখতে হবে, এই বিকর্ষণ এড়িয়ে প্রোটনরা নিজেদের সাথে যুক্ত হতে পারে কি না। হিসেব বলে, এতটা গতিশক্তি প্রোটনের নেই। কিন্তু ফিউশন তো হচ্ছে। কিন্তু কীভাবে?

আরও গভীর স্তরের এই কণাগুলো নিছক কণা হিসেবে আচরণ করে না। প্রতিটি প্রোটন এক একটি কোয়ান্টাম কণা। প্রতিটির আছে তরঙ্গ ফাংশন। বৈদ্যুতিক চার্জ তাদেরকে দূরে রাখলেও এরা তরঙ্গমালা প্রবাহিত করে একে অপরের কাছে চলে আসবে তার একটি অশূন্য সম্ভাবনা আছে। আর যেহেতু সূর্যে আছে বহু বহু (আগে উল্লিখিত) কণা, তাই তাদের মধ্যে অনেকেই (১০^২৮ টিতে একটি) একে অপরের কাছে চলে আসে।

চিত্র ৬

কোয়ান্টাম টানেলিং না থাকলে তাই নক্ষত্ররা আলো দিতে পারত না। মহাবিশ্বের বেশিরভাগ অংশ হত অন্ধকার, শীতল। আর সেজন্যেই গ্রহ-নক্ষত্ররা শুধু সার্বিক আপেক্ষিকতা দিয়ে চলছে বিষয়টি ঠিক না নয়। বড়-ক্ষুদ্র সব জগতের কাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

সূত্র

১। প্রিপোস্টারাসিউনিভার্স ডট কম, কোয়ান্টা ম্যাগাজিন

* http://www.preposterousuniverse.com/blog/2014/07/24/why-probability-in-quantum-mechanics-is-given-by-the-wave-function-squared/
* <https://www.quantamagazine.org/where-quantum-probability-comes-from-20190909/>
* <https://www.forbes.com/sites/ethansiegel/2015/06/22/its-the-power-of-quantum-mechanics-that-allow-the-sun-to-shine/>
* <https://www.theguardian.com/science/life-and-physics/2014/oct/19/understanding-quantum-tunnelling>
* <https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Map%3A_University_Physics_III_-_Optics_and_Modern_Physics_(OpenStax)/07%3A_Quantum_Mechanics/7.07%3A_Quantum_Tunneling_of_Particles_through_Potential_Barriers>
* http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Particles/protondec.html

মহাবিশ্বের সবচেয়ে ছোট জিনিস

মহাবিশ্বের সবচেয়ে ছোট জিনিস কোনটি? প্রশ্নটি করা যত সহজ,তার উত্তর কিন্তু তত সহজ নয়। চলুন আমরা নিজেরাই একটি উপায়ে চিন্তা করি। মানবদেহ নিয়েই ভাবা যাক না। আমাদের দেহ অনেকগুলো অঙ্গ নিয়ে গঠিত। এই যেমন হাত, পা, চক্ষু, যকৃত, কিডনি ইত্যাদি। এগুলো আবার অনেকগুলো উপাদান নিয়ে গঠিত। তবে একটি জায়গায় গিয়ে সব অঙ্গাণু সমজাতীয় হবে। সব অঙ্গাণুই অনেকগুলো কোষ নিয়ে গঠিত। শুধু মানুষই নয়, প্রায় যে-কোনো জীবেরই অন্যতম মৌলিক (!) উপাদান কোষ।

মানবদেহে আছে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কোষ। কোষকে ভাঙলে পাওয়া যাবে পানি, লিপিড, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও নিউক্লিক এসিড। পানিকে ভাঙলে তো পাওয়া যাবে মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। সাধারণত তেল, চর্বি, মোম ও স্টেরলকে একসঙ্গে লিপিড বলে। সেই হিসেবে এর প্রধান উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

প্রোটিনকে ভাঙলে পাওয়া যাবে অ্যামিনো এসিড। আর লিপিডের মতোই অ্যামিনো এসিডেও থাকে অন্যান্যের মধ্যে মৌলিক পদার্থ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

নিউক্লিক এসিড কোষের তথ্য বহনকারী প্রধান অণু। এর প্রধান অংশ হলো ডিএনএ ও আরএনএ। কিছু ভাইরাস ছাড়া প্রায় সব প্রাণীরই সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ডিএনএ। ডিএনএয়ের বংশগতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করা অংশের নাম আবার জিন। মানবদেহে প্রায় ৩০ হাজার জিন থাকে।নিউক্লিওটাইড নামক অণু দিয়ে ডিএনএ গঠিত। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে থাকে আবার একটি ফসফেট গ্রুপ, একটি শর্করা গ্রুপ ও একটি নাইট্রোজেন ক্ষার। ফসফেটে থাকে মৌলিক পদার্থ ফসফরাস ও অক্সিজেন। শর্করায়ও লিপিড ও অ্যামিনো এসিডের মতো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে।

তাহলে এখন মানবদেহের কোষের মৌলিক (!) উপাদানগুলো আমরা চিনলাম। তবে এগুলো তো হলো কোষে উপস্থিত মৌলিক পদার্থ। এর বাইরেও মানবদেহে বেশ কিছু মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। তবে দেহের ৯৯% মৌলিক পদার্থই ৬টি উপাদানে গড়া। এরা হলো অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। প্রায় ০.৮৫% ভাগ আছে আরও পাঁচটি মৌল। পটাসিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন ও ম্যাগনেসিয়াম।

মৌলিক পদার্থ নিয়ে ভাবলে মনে হবে মানবদেহে কত নানান রকম জিনিস দিয়ে গঠিত! কিন্তু পরমাণুকে আরও ভাঙলে কিন্তু সে ধারণা পাল্টে যেতে থাকে। অবশ্য এক সময় তো পরমাণুর চেয়েও আরও বড় বড় জিনিসকে প্রকৃতির সব বস্তুর মৌলিক উপাদান মনে করা হত। এরিস্টটল মনে করতেন সবকিছুর পেছনে চারটি মৌলিক উপাদান কাজ করে। মাটি, বায়ু, আগুন ও পানি। তবে ডেমোক্রিটাসের ধারণা আরেকটু উন্নত ছিল। কিন্তু সেটা নিখুঁত ছিল না। পরমাণু শব্দের ইংরেজি পরিভাষা অ্যাটম (atom) গ্রিক বিশেষণ atomos থেকে নেওয়া। নামটি তাঁরই দেওয়া। যার অর্থ যাকে আর ভাগ করা যায় না।

অষ্টদশ শতকের শেষের দিকে জন ডাল্টন পরমাণুবাদকে আরও শক্ত ভিত্তি দান করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, রাসায়নিক বস্তুসমূহ পরমাণু দিয়ে গঠিত। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরমাণু ধ্বংস বা পরবর্তিত হয় না। পরমাণু দিয়ে গঠিত যৌগিক পদার্থ যদিও পাল্টে যায়। কিন্তু বিক্রিয়ার আগে ও পরে মৌলগুলো একই থাকে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে ডাল্টন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন বলে পরমাণু সম্পর্কে এটাই প্রথম সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণু অবিকৃত থাকে। তাহলে কি পরমাণু বস্তুর একেবারে মৌলিক উপাদান? মোটেও নয়। ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত যদিও সেটাই মনে করা হত। ঐ বছর ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জে জে থমসন তাঁর ক্যাথোড রশ্মির পরীক্ষার মাধ্যমে আবিষ্কার করেন পরমাণুর অন্যতম কণা ইলেকট্রন। তার মানে পরমাণু আসলে পরম অণু নয়। একেও ভাঙা যায়। এছাড়া ১৯১৭ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে নিউজিল্যান্ড বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড পরমাণু নিয়ে অনেকগুলো পরীক্ষা চালান। আবিষ্কার করেন পরমাণুর কেন্দ্রের নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে পেলেন প্রোটনের দেখা। দেখা আগেই পেয়েছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী ইউজিন গোল্ডস্টেইন। ১৮৮৬ সালে। তবে তিনি সেটাকে নিছক হাইড্রোজেন মনে করেছিলেন। তার পেছনের কারণটাও মজার। আসলে পর্যায় সারণির প্রথম মৌল হাইড্রোজেন একটিমাত্র প্রোটন দিয়ে গঠিত। ক্রমশ ভারী মৌলগুলোতে একটি করে প্রোটন বাড়তে থাকে। সাধারণ হাইড্রোজেনে আবার নিউট্রনও থাকে না। এটিই একমাত্র মৌল যাতে কোনো নিউট্রন থাকে না। থাকে শুধু একটি প্রোটন। তাই সাধারণ হাইড্রোজেনের সাথে প্রোটনের কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণেই গোল্ডস্টেইন মনে করেছিলেন,পরমাণুতে কণার বদলে হাইড্রোজেন থাকে।

১৯২০ সালেই রাদারফোর্ড প্রস্তাব করেছিলেন, পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সাথে চার্জহীন আরেকটি কণাও আছে। ১৯৩২ সালে সেই কণা ধরা পড়ে জেমস চ্যাডউইকের পরীক্ষায়। এ জন্যে তিনি ১৯৩৫ সালে নোবেল পুরস্কারও পান। এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হলো, পরমাণু তিনটি মৌলিক কণা দিয়ে গঠিত। ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। যে কোনো বস্তুকে ভাঙলেই শেষ পর্যন্ত এই কণাগুলোকে পাওয়া যাবেই। আমরা অনেক সময় সব মানুষ সমান এই কথা প্রমাণ করতে বলি, সব মানুষের মধ্যেই থাকে একই রকম লাল রক্ত। তাহলে কেন এত ভেদাভেদ? কেন সাদা-কালোর বিভক্তি? ব্যাপার হলো, শুধু রক্ত কেন, আরও গভীরে গিয়ে ভাবলে সব মানুষই তো একই রকম কণা দিয়ে গঠিত পদার্থে তৈরি। তাহলে ভেদাভেদ আসলেই থাকা উচিত নয়।

কিন্তু তাহলে কি পরমাণুর এই তিনটি কণাই মহাবিশ্বের সবচেয়ে ছোট জিনিস? একটা সময় পর্যন্ত সেটাই সত্যি মনে করা হত। কিন্তু সব বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে ইলেকট্রন, প্রোটনদের পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকেও ভাঙার কৌতূহল মনে জন্মাতেই পারে। জয় হয়েছে সেই কৌতূহলেরও। ১৯৬৪ সালে দুজন বিজ্ঞানী স্বাধীনভাবে প্রস্তাব করেন কোয়ার্ক মডেল। তাঁরা হলেন মারে গেল ম্যান ও জর্জ জুইগ। ১৯৬৮ সালের এক পরীক্ষায় দেখা যায়, প্রোটন আসলেই মৌলিক কণা নয়। এটি গঠিত আরও অনেক ছোট বিন্দুসদৃশ কিছু কণা দিয়ে। শুরুতে অবশ্য বিজ্ঞানীরা এদেরকে কোয়ার্ক বলতে রাজি হননি। রিচার্ড ফাইনম্যান এদের নাম দিয়েছিলেন পারটন। পরে দেখা যায়, এই কণাগুলোই গেলম্যানদের প্রস্তাবিত কোয়ার্ক।

সে সময় দুই ধরনের কোয়ার্ক আবিষ্কৃত হয়েছিল। আপ ও ডাউন কোয়ার্ক। পরে আরও চার প্রকার কোয়ার্ক পাওয়া যায়। ১৯৯৫ সালে সর্বশেষ কোয়ার্ক হিসেবে টপ কোয়ার্ক আবিষ্কৃত হয়। বাকি তিন প্রকার কোয়ার্কের নাম স্ট্রেঞ্জ, চার্ম ও বটম। প্রোটন ও নিউট্রন দুটোই কোয়ার্ক দিয়েয় গঠিত। প্রোটনে থাকে দুটি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন কোয়ার্ক। আর নিউট্রনে দুটি ডাউন ও একটি আপ কোয়ার্ক। তার মানে প্রোটন ও নিউট্রন দুটো কণাই অমৌলিক। তবে পরমাণুর কেন্দ্রের বাইরের দিকে থাকা ইলেকট্রনকে অমৌলিক বলার মতো কোনো তথ্য এখনও মেলেনি।

এখন পর্যন্ত আমরা তাহলে যা জানলাম সেটি অনুসারে কোয়ার্ক ও ইলেকট্রনরা মৌলিক কণা। অবশ্য শুধু ইলেকট্রন বললে একটু ভুল থেকে যায়। ইলেকট্রনের সমগোত্রীয় আরও কিছু কণাও আছে যারা মৌলিক। এদেরকে এক নামে বলা হয় লেপটন। এরা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। চার্জধারী ও প্রশম। প্রথম কাতারে রয়েছে ইলেকট্রনসহ মিউওন ও টাউ। আর প্রশম বা চার্জহীন কণাগুলো হলো ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউওন নিউট্রিনো ও টাউ নিউট্রিনো।

এখানেই শেষ নয়। মৌলিক কণা (!) আছে আরও। হিগস বোসন ও গজ বোসন। এর মধ্যে গজ বোসন কণারা বলবাহী কণা হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলের প্রতিটির জন্যে একটি করে এমন কণা রয়েছে। সবল নিউক্লীয় বলের জন্যে রয়েছে গ্লুওন কণা। দুর্বল নিউক্লীয় বলের জন্যে ডাব্লিউ ও জেড বোসন, আর তড়িচ্চুম্বকীয় বেলর জন্যে ফোটন বা আলোর কণা। অপর মৌলিক বল মহাকর্ষের জন্যে প্রস্তাবিত বলবাহী কণা গ্র্যাভিটন এখনও স্বীকৃত কণা নয়। এদের বাইরে রয়েছে হিগস বোসন। যার অপর নাম ঈশ্বর কণা। মৌলিক কণিকাদের ভরের জন্যে এই কণা দায়ী।

এত এত মৌলিক কণা প্রকৃতিতে। এখন পর্যন্ত এরা অন্য কোনো কিছু দিয়ে তৈরি বলা জানা নেই। তার মানে এদের মধ্যে যে সবার ছোট হয়ত সে-ই হবে মহাবিশ্বের সবচেয়ে ছোট জিনিস। কিন্তু এখানেই এক সমস্যা। ফোটন, নিউট্রন, কোয়ার্ক ইত্যাদি মৌলিক কণাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। সবারই আছে নির্দিষ্ট চার্জ বা আধান, ঘূর্ণন, ভর, শক্তি। কিন্তু এদের সাইজ বা আকার অসজ্ঞায়িত। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কণাকে তরঙ্গ সমীকরণ আকারে দেখানো হয়। সাধারণত এদেরকে শূন্য সাইজের একক বিন্দু কণা বিবেচনা করা হয়। সাইজ শূন্য ও ভর অশূন্য হলে কণার ঘনত্ব হয় অসীম। কারণ ঘনত্ব পাওয়া যায় ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ করে। আয়তন শূন্য হলে ভাগ দিতে হয় শূন্য দিয়ে। অবস্থাভেদে যাকে অসীম বা অসংজ্ঞায়িত দুটোই বলা চলে।

গণিতবিদ বলুন কিংবা পদার্থবিদ, অসীম এড়িয়ে চলতে চান সবাই। কারও কারও মতে ইলেকট্রনদের মতো কণাদের সাইজ জিজ্ঞেস করা একটি অর্থহীন প্রশ্ন। মূলত মৌলিক কণারা আসলে ভৌত অর্থে কোনো বস্তুই নয়। তাই সে অর্থেই এদের সাইজই নেই। যদিও তড়িচ্চুম্বকীয় সাইজ নামে বিমূর্ত একটি ধারণা আছে।

তাহলে সবচেয়ে ছোট কে? এর কয়েকটি সান্ত্বনা উত্তর আছে। আমরা প্রোটনের সাইজ জানি। যদিও প্রোটন আসলে যৌগিক কণা। ২০১৯ সালের দুটি আলাদা পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে প্রোটনের ব্যাসার্ধ ০.৮৩৩ ফেমটোমিটার। দশমিকের পর ১৪টি শূন্য দিয়ে ১ লিখলে যা হয় ১ ফেমটোমিটার সমান তত। ভাবুন তাহলে কত ছোট। তবে মজার ব্যাপার হলো, প্রোটনের চেয়ে ছোট সাইজের এমন কোনো বস্তু নেই যার দৈর্ঘ্য আমরা পরিমাপ করতে পারি। ওদিকে কোয়ার্ক দিয়ে গড়া আরেক যৌগিক কণা নিউট্রন প্রোটনের চেয়ে সামান্য বড়। ব্যাসার্ধ ০.৮৫ ফেমটোমিটার।

তাহলে আসলেই কে সবচেয়ে ছোট বা তার সাইজ কত তা জানার উপায় কী? এখন পর্যন্ত আসলে ইলেকট্রন ও কোয়ার্করা অবিভাজ্য কণা হলেও বিজ্ঞানীরা আসলে জানেন না এরাই প্রকৃতির সবচেয়ে ছোট সম্ভাব্য বস্তুকণা কি না। আগেই বলেছি, পরীক্ষায় দেখা যায়, ইলেকট্রন, কোয়ার্কদের মতো মৌলিক কণারা বিন্দুর মতো আচরণ করে। দখল করে না স্থান। ফলে পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো জটিল হয়ে পড়ে। কারণ আপনি একটি বিন্দুর দিকে অসীম পরিমাণ নিকটবর্তী হতে পারেন। ফলে ক্রিয়াশীল বলও হবে অসীম। এ কারণেই বিজ্ঞানীরা অসীম নিয়ে এত বিব্রত।

সমাধান হয়ত আছে স্ট্রিং থিওরি কাছে। তত্ত্বটি বলছে,কণাগুলো আসলে বিন্দুর মতো নয়। বরং স্ট্রিং বা সুতা বা তন্তুর ফাঁসের (লুপ) মতো। তন্তুর ফাঁসের দিকে তো আর অসীম পরিমাণ যেতে থাকা সম্ভব নয়। কারণ ফাঁসের একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে কাছে থাকবেই। এই ফাঁসের মাধ্যমে অসীম নিয়ে সৃষ্ট কিছু সমস্যার সমাধান করা যায়। এ কারণে স্ট্রিং তত্ত্বকে অনেকেই পছন্দ করেন। কিন্তু সমস্যা হলো, তত্ত্বটির পক্ষে কোনো পরীক্ষামূলক প্রমাণ নেই।

সমাধানের আরেকটি রাস্তা চিন্তা করা যায়। স্থান হয়ত অবিচ্ছিন্ন (continuous) ও মসৃণ নয়। হয়ত বিচ্ছিন্ন পিক্সেল বা কণা দিয়ে গঠিত। যাকে অনেক সময় বলা হয় স্থান-কালের ফেনা (space-time foam)। এভাবে ভাবলেও দুটো কণা একে অপরের অসীম পরিমাণ কাছাকাছি হতে পারে না। কারণ তারা সবসময় বিচ্ছিন্ন ন্যূনতম কণার সাইজ পরিমাণ দূরত্বে আলাদা আলাদা থাকবে।

সবচেয়ে ছোট বস্তুর রহস্যের সমাধানের পথ এখানেই শেষ নয়। সবচেয়ে ছোট বস্তুটি হতে পারে ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রের সিঙ্গুলারিটি। ব্ল্যাক হোলে এত বেশি পরিমাণ পদার্থ খুব ছোট্ট জায়গায় এমনভাবে গুটিয়ে থাকে যে সবগুলো বস্তু ভেতরের দিকে গিয়ে সঙ্কুচিত হতে হতে সবকিছু একটি বিন্দুতে গিয়ে অবস্থান নেয়। ফলে বিন্দুটির সাইজ হয় শূন্য। আর ঘনত্ব হয় অসীম। এ বিষয়ে একটু আগেও আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। মজার ব্যাপার হলো, ব্ল্যাক হোল থেকে আলো বের হতে না পারার সীমানা কিন্তু অনেক বড় হতে পারে। যার নাম ঘটনা দিগন্ত। কিন্তু ব্ল্যাকহোলের নিজের সাইজ কিন্তু সেই বিন্দুই।

তবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই বলছেন, ব্ল্যাক হোলের ঘনত্ব অসীম হওয়ার কথা নয়। বর্তমানে পদার্থবিদ্যা দুটো তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সার্বিক আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স। দুটো তত্ত্বের সম্পর্ক দা-কুমড়ার মতো। মৌলিক বল মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করে আপেক্ষিকতা। আর অপর তিন বল চলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিয়ে। একের জগতে অন্য তত্ত্ব কাজ করে না। তাই বিজ্ঞানীদের মতে আসলে দুটো তত্ত্বের অনৈক্যের ফলেই অসীমের মতো ধারণার জন্ম হয়েছে। দুটো তত্ত্বকে ঐকতানে আনা সকল পদার্থবিদেরই স্বপ্ন। স্বপময় সেই সমন্বিত তত্ত্বের নাম কোয়ান্টাম মহাকর্ষ। হয়ত কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব পাওয়া গেলেই ব্ল্যাকহোলের সত্যিকারের রহস্য উন্মোচিত হবে।

পদার্থবিদ অ্যান্ডি পার্কার বিবিসিতে এ নিয়ে *মহাবিশ্ব কত ছোট* নামে একটি অনুষ্ঠান করেন। তিনি বলেন, “আমার মনে হয় না ব্ল্যাকহোলের ঘনত্ব অসীম হতে পারে। হয়ত সেটা কোয়ার্কের চেয়েও অনেক অনেক ছোট। হতে পারে এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য আমরা দেখেছি সেটা তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ কিংবা তার চেয়েও ছোট।”

এটাই হয়ে থাকলে সিংগুলারিটির সাইজ হবে স্ট্রিংয়েরই সমান। অবশ্য যদি স্ট্রিং বলতে সত্যিই কিছু থেকে থাকে।

আবার এমনও হতে পারে, স্ট্রিং, সিংগুলারিটি বা মহাবিশ্বের সবচেয়ে ছোট কণা সবাই প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের সমান। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ধ্রুবক। এর মান হলো দশমিকের পর ৩৪টি শূন্য দিয়ে তারপর ১৬। গালভরা শব্দ দিয়ে বললে সংখ্যাটি হবে ১.৬ × ১০-৩৪। তাত্ত্বিকভাবে মনে করা হয়, এর চেয়ে ছোট কোনো দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে কোনো যন্ত্র দিয়েই প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্য মাপা সম্ভব নয়। অনিশ্চয়তা নীতির একটি সরল রূপ হলো, অতিপারমাণবিক কণাদের অবস্থান ও বেগ একইসাথে মাপা যায় না। এর একটি যত ভালভাবে বের করা হবে, অপরটি তত অনিশ্চিত হয়ে যাবে। আসলে প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যই বলে কতটুকু অনিশ্চিত হবে। কণার বেগ মাপলে এর অবস্থান প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের চেয়ে সূক্ষ্ম করে মাপা সম্ভব নয়। তাহলে কী দাঁড়াল? মহাবিশ্বে প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যের চেয়েও ছোট কিছু থাকলেও সেটা আমরা মাপতেই পারব না। কারণ এর চেয়ে ছোট দৈর্ঘ্যে মহাবিশ্ব হয়ে যাবে সম্ভাবনা নির্ভর ও অনির্ণেয়। তার মানে আপাতত প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্যই আমাদের মহাবিশ্বের সবচেয়ে ছোট জিনিসের সম্ভাব্য সাইজ।

তবে এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার উত্তর পেতে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ তত্ত্ব খুব প্রয়োজন।

সূত্র: স্টাডি ডট কম, এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, সক্রেটিক ডট অর্গ, লাইভসায়েন্স ডট কম, স্ট্যানফোর্ড এজু, বিবিসি ডট কম, স্পেস ডট কম।

* <https://towardsdatascience.com/unsupervised-machine-learning-clustering-analysis-d40f2b34ae7e>
* http://whoami.sciencemuseum.org.uk/whoami/findoutmore/yourbody/whatdoyourcellsdo/whatisacellmadeof/whatareproteinsmadeof
* https://study.com/academy/lesson/what-are-amino-acids-definition-structure-quiz.html
* <https://www.quora.com/What-are-cells-made-of/answer/Lawal-Rashidat-Adelola>
* https://www.britannica.com/science/nucleic-acid
* https://www.livescience.com/37247-dna.html
* https://www.sutori.com/story/atomic-theory-timeline--GtGsBHe8bqzrzFeP6tEng4Vo
* <https://www.quora.com/Why-is-an-atom-known-as-a-misnomer>
* <https://plato.stanford.edu/entries/atomism-ancient/>
* <https://courses.lumenlearning.com/introchem/chapter/john-dalton-and-atomic-theory/>
* <https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_theory#Discovery_of_subatomic_particles>
* <https://en.wikipedia.org/wiki/Quark>
* https://en.wikipedia.org/wiki/Lepton
* https://socratic.org/questions/what-is-the-smallest-elementary-particle
* <https://chem.libretexts.org/Courses/University_of_British_Columbia/CHEM_100%3A_Foundations_of_Chemistry/04%3A_Atoms_and_Elements/4.4%3A_The_Properties_of_Protons%2C_Neutrons%2C_and_Electrons>
* <https://www.space.com/17629-smallest-ingredients-universe-physics.html>
* http://www.bbc.co.uk/programmes/b01mmrc0
* <https://www.fnal.gov/pub/today/archive/archive_2013/today13-11-01_NutshellReadMore.html>

মহাবিশ্বের ঘূর্ণন

আমাদের পরিচিত সব মহাজাগতিক বস্তুই ঘুরছে। পৃথিবী ঘুরছে। সেই ঘূর্ণনে ঘটছে সূর্যের উদয়-অস্ত। ঘুরছে সূর্য। সূর্যের বিষুব অঞ্চল পুরো একবার ঘুরতে সময় নেয় ২৪.৪৭ দিন। মেরু অঞ্চলে সময়টা বেশি। ৩৮ দিন। ঘুরছে চাঁদ। পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার পাশাপাশি একই সময়ে চাঁদ নিজের অক্ষের চারপাশেও ঘূর্ণন শেষ করে। কাজটা করতে সময় লাগে ২৭.৩২ দিন।

ঘুরছে অন্য গ্রহ-উপগ্রহরাও। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতিরাও নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরছে প্রতিনিয়ত। এর মধ্যে পৃথিবীর সাথে সবচেয়ে মিল মঙ্গল গ্রহের। এটি নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরে ১.০৩ দিনে। শুক্র গ্রহ তো আবার ঘোরে অন্য গ্রহদের থেকে উল্টো দিকে। যার ফলে এতে সূর্যের উদয় ঘটে পশ্চিমে। ইউরেনাসের ঘূর্ণন তো আরও অদ্ভুত। এর ঘূর্ণনঅক্ষ কক্ষপথের সাথে ৯৭ ডিগ্রি বেঁকে আছে। ফলে গ্রহটির একটি মেরু সব সময় সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। এমন ঘটনা আর কোনো গ্রহেই দেখা যায় না। একটি অংশে চিরকালের জন্যে রাত আর অপর অংশ সবসময় দিন! কী অদ্ভুত!

সৌরজগতে গ্রহরা ছাড়াও আছে প্রায় আট লাখ মাইনর প্ল্যানেট বা ক্ষুদ্র গ্রহ। বামন গ্রহদেরও (যেমন প্লুটো) সংজ্ঞা অনুসারে ক্ষুদ্র ধরা হয়। এদের সবাইও কিন্তু ঘুরছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে জোরে ঘুরছে ২০১৭কিউজি১৮ নামের বস্তুটি। নিজের অক্ষের সাপেক্ষে পাক খেতে এর সময় লাগে মাত্র ১২ সেকেন্ড। অবশ্য এর ব্যাসও ছোট। মাত্র ১০ মিটার। ঘুরতে সমান সময় নেয় আরেক ক্ষুদ্র গ্রহ ২০১৯ বিই৫। তবে ব্যাস বেশি–৩০ মিটার।

আবার উল্টো ঘটনাও আছে। মাত্র ৭৮০ মিটার ব্যাসের একটি গ্রহাণুর পুরো এক আবর্তনে সময় লাগে ৭৮ দিন। নাম (১৬২০৫৮) ১৯৯৭এই১২। এখন পর্যন্ত জানা তথ্য মতে এটিই মহাবিশ্বের সবচেয়ে ধীরে ঘোরা বস্তু। গ্রহদের মধ্যে শুধু বুধের ঘূর্ণনই এর কিছুটা কাছাকাছি (৫৮ দিন)। এর বাইরে মঙ্গল ছাড়া আর সব গ্রহই পৃথিবীর চেয়ে কম সময়ে একবার পূর্ণ-আবর্তন করে।

সূর্য একাই ঘুরছে না, ঘুরছে সূর্যের মতো কোটি কোটি নক্ষত্রও। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরি। এতে একবার পূর্ণ আবর্তন হয় ৮৩ দিনে। আর আবর্তন বেগ সেকেন্ডে প্রায় একশ মিটার। অবশ্য সূর্যের আবর্তন বেগ এর দ্বিগুণেরও বেশি। সেকেন্ডে ২০৫ মিটার। পৃথিবীর তো আরও বেশি। সেকেন্ডে ৪৬৫ মিটার।

বোঝাই যাচ্ছে মহাজাগতিক সব বস্তুই ঘুরছে। এই যেমন সূর্যের আরেক প্রতিবেশি নক্ষত্র বার্নাডের তারা। এর আবর্তন সম্পন্ন হয় ১৩০ দিনে। একইভাবে ঘুরছে দূরের বা কাছের অন্য সব নক্ষত্রও।

নক্ষত্রের সমাবেশ নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটি ছায়াপথ। আমাদের ছায়াপথের নাম মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা। আকৃতিটা সর্পিল। আর আকারটা কত বিশাল! এক প্রান্ত থেকে আলো নিক্ষেপ করলে সে আলো আরেক প্রান্তে পৌঁছবে এক লক্ষ বছর পরে। মিল্কিওয়ে ও অ্যান্ড্রোমিডাসহ ৫০-এর বেশি ছায়াপথ নিয়ে একটি গুচ্ছের নাম লোকাল গ্রুপ। লোকাল গ্রুপের দ্বিতীয় বৃহত্তম ছায়াপথ আমাদের আকাশগঙ্গা। মজার ব্যাপার হলো আকাশগঙ্গাও কিন্তু আবর্তিত হচ্ছে। যেমন করে আবর্তিত হচ্ছে এর অভ্যন্তরের গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যাসীয় কণারা। ঠিক যেন বাচ্চাদের খেলনা পিনহুইল।

ছায়াপথের ঘূর্ণন বেগটাও মারাত্মক। সেকেন্ডে ২৭০ কিলোমিটার। অথচ একটু আগে আমরা পৃথিবী, সূর্যদের বেগ দেখেছিলাম মিটারে। অথচ এই বিশাল বেগ নিয়েও এর একবার ঘুরতে সময় লাগে ২০ কোটি বছর। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, একটু আগে আমরা একটি গ্রহাণুকে সবচেয়ে ধীর বস্তু বলেছিলাম। আকাশগঙ্গা কি তার চেয়ে ধীর নয়? আসলে ধীরের বিচার করা হয় বেগ দিয়ে, আবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিয়ে নয়।

কিন্তু আকাশগঙ্গা এই ঘূর্ণন কোথায় পেল? এ থেকে কি আমরা মহাবিশ্বের ঘূর্ণনের কোন হদিস পেতে পারি? এখানে উল্লেখ্য, সৌরজগত, মানে সূর্য ও তার দলবল ছায়াপথের কেন্দ্রকে পুরো একবার ঘুরে আসতে সাড়ে ২২ কোটি বছর সময় লাগে। তার মানে, মহাশূন্যে ছায়াপথের আবর্তন ছাড়া কোনো গতি নেই ধরে নিলে আমরা সর্বশেষ মহাশূন্যের একই জায়গায় ছিলাম ২২ কোটি বছর আগে। মানে যখন ডাইনোসরদের উত্থান হচ্ছিল।

বিজ্ঞানীরা আকাশগঙ্গার ঘূর্ণনের ছবি পেয়েছেন এক গুচ্ছ বেতার টেলিস্কোপের সাহায্যে। এদের সম্মিলিত নাম ভেরি লার্জ বেজলাইন অ্যারে (ভিএলবিএ। তারা নিবিড়ভাবে খেয়াল করলেন কোন কোন জায়গাগুলোতে নতুন নক্ষত্র তৈরি হচ্ছে। এছাড়া দেখলেন, কোন জায়গায় গ্যাসীয় অণু বেতার তরঙ্গের তীব্রত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমন জায়গাগুলোয় বেতার তরঙ্গ খুব শক্তিশালী হয়।

পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে এই অণুগুলোর অবস্থান দূরবর্তী বস্তুর সাপেক্ষে বদলে যায়। এই পরিবর্তন মেপে সম্পূর্ণ ছায়াপথের ঘূর্ণন সম্পর্ক ধারণা পাওয়া যায়। আবার এই প্রক্রিয়া থেকেই পুরো ছায়াপথের ভরও বোঝা যায়। তা ঠিক আছে, কিন্তু ছায়াপথ কেন ঘুরছে?

প্রাথমিক মহাবিশ্ব নিয়ে কথা বলতেই আমরা সাধারণত দুটি জিনিস অনুমান করে নেই। প্রাথমিক মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম উপস্থিত ছিল। আর কিছু অঞ্চল অন্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি ঘন ছিল। ঘন অঞ্চলে গ্যাসেরা পুঞ্জিভূত হয়ে ভ্রুণছায়াপথীয় মেঘ তৈরি করে। আর সবচেয়ে ভারী অঞ্চলগুলো গুটিয়ে এসে নক্ষত্রে পরিণত হয়।

এই নক্ষত্রগুলো দ্রুত জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৈরি হয় বটিকাকার নক্ষত্রগুচ্ছ। কিন্তু মহাকর্ষের ফলে গ্যাসেরা আরও সঙ্কুচিত হতে থাকে। গ্যাসেরা গুটিয়ে আসার সময় তৈরি হয় আবর্তনশীল চাকতি। আবর্তনশীল এই চাকতি মহাকর্ষকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন গ্যাস ও ধুলকণাকে আকৃষ্ট করতে থাকে। এই চাকতির ভেতরে জন্ম নেয় নতুন নতুন নক্ষত্র। মূল মেঘের বাইরের দিকে থেকে যায় বটিকাকার নক্ষত্রগুলো। এছাড়াও গ্যাস, ধুলিকণা ও ডার্ক ম্যাটার।

বিষয়টাকে সহজ করে চিন্তা করা যাক। ধরুন আমরা পিৎজা বানাচ্ছি। তবে একটু হাস্যকর উপায়ে। গোল করে ময়দার তাল বানিয়ে নিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারলাম উপরের দিকে। গোল এই তালের ঘূর্ণনে তৈরি হবে একটি চ্যাপ্টা চাকতি। আকাশগঙ্গাও কিন্তু দেখতে এই চ্যাপ্টা চাকতির মতোই। অবশ্যই সেই চাকতিটি আরও জটিল অবস্থায় আছে। চাকতির এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র।

এবার দেখা যাক আকাশগঙ্গা কোন দিকে ঘুরছে। আসলে এটা নির্ভর করছে আমরা কীভাবে দেখছি তার ওপর। একটি লাটিমের কথা ভাবা যাক। ধরুন, একে আমরা একটি গ্লাস টেবিলের ওপর ঘড়ির কাঁটার দিক বরাবর ঘুরিয়ে দিলাম। এবার যদি আমরা টেবিলের নীচ থেকে এর দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে এটি ঘুরছো ভিন্ন দিকে–ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে।

এটা আমরা অসংখ্য ভিন্ন উপায়ে বুঝতে পারি। একটি কাগজে গোল করে ঘড়ির কাঁটার দিকে একটি তীর আঁকি। কাগজটিকে আলোর সামনে ধরে অন্য পাশ থেকে দেখলে মনে হবে তীর আঁকা হয়েছে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। ফলে ঘূর্ণনের দিকও আসলে নির্ভর করে আমরা কোন দিক থেকে দেখছি তার ওপর।

তাহলে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আকাশগঙ্গার ঘূর্ণন কোন দিকে? এর উত্তরের জন্য আবার ছায়াপথের আকৃতিও জানতে হবে। আকাশগঙ্গা অনেকগুলো সর্পিল বাহু নিয়ে গঠিত। তাই একে সর্পিল ছায়াপথ বলা হয়। সেই হিসেবে সর্পিল ছায়াপথদের অর্ধেক অংশ ঘড়ির কাঁটার দিকে ও বাকি অংশ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার কথা। কয়েক বছর আগে ধারণাটি প্রমাণও করেছেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ, প্রায় ঘড়ির কাঁটার দিকে ও বিপরীত দিকে ঘোরা ছায়াপথের সংখ্যা সমান। বিষয়টি আবার আইসোট্রোপিক মহাবিশ্বেরও একটি প্রমাণ। আইসোট্রৈপিক মহাবিশ্ব মানে মহাবিশ্ব সব দিকে একই রকম দেখায়। বড় মাপকাঠিতে আমরা মহাবিশ্বের যেদিকেই তাকাবো, দেখব প্রায় একই রকম চিত্র।

বিশাল মহাবিশ্ব থেকে চোখ ফিরিয়ে একটু ক্ষুদ্র জগতে আসা যাক। কোয়ার্ক, প্রোটনরাও কি গ্রহ-নক্ষত্রের মতো ঘোরে? পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অন্যতম কণা প্রোটন। যত ভারী পরমাণু তত বেশি প্রোটন। প্রোটন সংখ্যাই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা। যা দিয়ে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ধারিত হয়। নিউক্লিয়াসে আরও থাকে নিউট্রন। যার একমাত্র ব্যতিক্রম একক ভরের হাইড্রোজেন। প্রোটন আর নিউট্রন দুটোই কোয়ার্ক আবার দিয়ে গড়া।

প্রোটন মৌলিক কণা না হলেও কোয়ার্ক ঠিকই মৌলিক। মজার ব্যাপার হলো, ঘূর্ণন সব মৌলিক কণার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য কণার ঘূর্ণনকে আমাদের চেনাজানা ঘূর্নোণের সাথে ঠিক মেলানো যাবে না। লাটিম, গ্রহ আর কণা এক জিনিস নয়। অতিপারমাণবিক কণারা আসলে আচরণ করে বিন্দুর মতো, যার নেই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা। অন্য কথায় এটি একটি মাত্রাহীন বস্তু। কিন্তু হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির কারণে বিন্দু কণার বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকের চেয়ে জটিল হয়ে ওঠে। কারণ অভ্যন্তরীণ কোনো কাঠামোবিহীন মৌলিক কণাও স্থান দখল করে।

কোয়ার্করা হলো স্পিন-হাফ কণা। মানে এদের গঠনের প্রাথমিক বিন্যাসে ফিরে আসতে হলে দুইবার পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে হয়। ফলে কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত প্রোটন ও নিউট্রন কণাও স্পিন-হাফ কণা। একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নিউক্লিয়াসের বাইরের কণা ইলেকট্রনের মধ্যেও। একটি প্রোটনে থাকে দুটো আপ-কোয়ার্ক ও একটি ডাউন-কোয়ার্ক। আবার একটি নিউট্রনে থাকে দুটো ডাউন-কোয়ার্ক ও একটি আপ-কোয়ার্ক। প্রকৃতির চারটি মোলিক বলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলের নাম সবল নিউক্লিয় বল। নাম দেখেই বোঝা যায়, এর কাজের ক্ষেত্র নিউক্লিয়াস। কোয়ার্কদের ধরে রাখে এই বলটিই। আবার প্রোটন আর নিউট্রনকেও জড়িয়ে রাখে এই একই বল। কথাটা আসলে আগের কথারই ভিন্ন রূপ।

এই সবল বলের কারণেই বড় বড় নিউক্লিয়াস তৈরি হতে পারে। অন্যথায় বড় মৌলের ক্ষেত্রে প্রোটন-প্রোটন ধনাত্মক চার্জের বিকর্ষণে নিউক্লিয়াস ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। এখন, ইলেকট্রনের মতো প্রোটন ও নিউট্রনও কিন্তু ঘোরে, যার দুটোই কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি। আগেই বলেছি, এ ঘূর্ণন আমাদের পরিচিত ঘূর্ণনের মতো নয়। ইলেকট্রনের ঘূর্ণন তো আরও বেশিই জটিল।

এবার আসা যাক পুরো নিউক্লিয়াসের কথায়। নিউক্লিয়াসের কি ঘূর্ণন আছে? আবারও মনে করিয়ে দেই, পরমাণুর জগতের এসব ঘূর্ণন লাটিম বা গ্রহের ঘূর্ণনের মতো নয়। বোঝার সুবিদার্থে আমরা নিউক্লিয়াসকে ঘুরন্ত টেনিস বলের ক্ষুদ্র রূপ ভাবতে পারি। তবে এভাবে ভাবতে ভাবতে এক সময় আমরা হারিয়ে যাব ভুলের রাজ্যে। তা যাই হোক, অতিপারমাণবিক জিনিসদের দুটো বৈশিষ্ট্য আছে। কক্ষপথের কৌণিক ভরবেগ ও ঘূর্ণনজনিত কৌণিক ভরবেগ। অবশ্য এরা ঠিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং বৈশিষ্ট্য নির্ধারক।

এখন, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের স্পিন বা ঘূর্ণন শূন্য বা অশূন্য দুটোই হতে পারে। নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার যোগফল বিজোড় সংখ্যা হলে নিউক্লিয়াসটির ঘূর্ণন থাকবে। যেমন কার্বনের ১২ ভরের আইসোটপের স্পিন থাকবে না। কিন্তু কার্বন-১৩ এর স্পিন থাকবে।

তবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা দিয়ে ঘূর্ণন বুঝতে গেলে মাথায়ই ঘূর্ণন শুরু হবে। এই ব্যাখ্যা বলছে, অতিপারমাণবিক কণাদের সাধারণ অর্থে ভৌত কোনো অস্তিত্বই নেই। এরা থাকে সম্ভাবনা ঘনত্ব নিয়ে। যতক্ষণ না এদেরকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। পর্যবেক্ষণের ফলে এরা অস্তিত্ব লাভ করে। পায় নির্দিষ্ট অবস্থান। যে কণারা নিছক সম্ভাবনা হিসেবে বিরাজ করে তাদের আবার গঠন বা ঘূর্ণন নিয়ে কিছু বলার সুযোগ কোথায়?

আসলে ঘূর্ণন বলতে বোঝায় বস্তুর মোট কৌণিক ভরবেগ। এই কথা কিবন্তু গ্রহের ক্ষেত্রেয়াও খাটে। অর্থাৎ, একটি গ্রহের সবগুলো মৌলিক কণার কক্ষপথীয় কৌণিক ও ঘূর্ণন ভরবেগের যোগফলই গ্রহটির ঘূর্ণন। একই কথা খাটে পরমাণু, পরমাণুর নিউক্লিয়াস কিংবা প্রোটনের মতো যৌগিক কণার ক্ষেত্রেও।

তবে চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় কৌণিক ভরবেগ একটি অবিচ্ছিন্ন সংখ্যা। মানে এর মান যে-কোনো সংখ্যা বা যে-কোনো দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী যে-কোনো সংখ্যা হতে পারে। সেটা হতে পারে ২.১১ কিংবা ৩.০১২ একক। বা এই দুটি সংখ্যার মতো যে-কোনো দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী অন্য যে-কোনো সংখ্যা। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কৌণিক ভরবেগ হলো কোয়ান্টায়িত। এর মান যে-কোনো কিছু হতে পারে না। হবে শুধু প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবককে পাই (৩.১৪) এর চারগুণ দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত সংখ্যার গুণিতক আকারে। কথাটি নীলস বোর ১৯১৩ সালে প্রস্তাব করেন। এরই ভিত্তিতে তিনি হাইড্রোজেনের বর্ণালি রেখার ব্যাখ্যা দেন।

অর্থাৎ, কোয়ান্টায়িত হলেও বিন্দুসদৃশ মৌলিক কণাদেরও ঘূর্ণন থাকতে পারে। এর কারণ স্পষ্ট নয়। অনেকের মতো, হতে পারে এসব মৌলিক কণাও অন্য কণা দিয়ে তৈরি।

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। মহাবিশ্ব নিজেও কি ঘুরছে? অন্য বহু বিষয়ের মতো এটিও সরাসরি জানার কোনো উপায় নেই। মহাবিশ্বকে তো আর পরীক্ষাগারে রেখে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব নিয়ে কাজ করার সময় ধরে নিয়েছেন, মহাবিশ্ব ঘুরছে না। আরও ধরে নিয়েছেন, এটি আইসোট্রোপিক। মানে বড় মাপকাঠিতে চিন্তা করলে সব দিকে একই রকম দেখায়। বড় মাপকাঠিতে মহাবিশ্ব নিয়ে কাজ করতে আমরা ব্যবহার করি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। আরও ভালো করে বললে আইনস্টাইন ক্ষেত্র সমীকরণ। এই সমীকরণের সাথে অঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের ধারণার বিরোধ নেই। আবার সমীকরণ এও বলছে না যে মহাবিশ্ব ঘুরতে পারবে না।

তবে বিজ্ঞান শুধু অনুমান করে বসে থাকে না। সেটা যাচাইও করে। আমাদের দেখা মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরানো আলোর নাম মহাজগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি (সংক্ষেপে সিএমবি) । বিগ ব্যাংয়ের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বছর পর এই আলো তৈরি হয়। আলোটির রেশ মহাবিশ্বে আছে আজও।

এই আলোর প্রতিক্রিয়া মহাবিশ্বের সব দিকে একই রকম। তবে তাপমাত্রায় সামান্য উঠা-নাম আছে। এক ডিগ্রির এক হাজার ভাগের এক ভাগ। এর কারণ হলো মহাবিশ্বের জন্মের পরে গড়িয়ে যাওয়া সময়, মহাবিশ্বের উপাদান ও আকার। এই পার্থক্যগুলো কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন মহাবিশ্ব কি কোনো নির্দিষ্ট দিকে বেঁকে আছে কিনা। অথবা ঘুরছে কি না বা প্রসারণ কোনো এক দিকে অন্য দিকের চেয়ে বেশি হচ্ছে কিনা।

২০১৬ সালে ফিজিকেল রিভিউ লেটার্স জার্নালের এক নিবন্ধে বিজ্ঞানীরা দেখেয়েছেন, সিএমবি আলো থেকে মহাবিশ্বের ঘূর্ণনের পক্ষে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়াও দেখা গেছে মহাবিশ্ব আইসোট্রপিক হবার সম্ভাবনা আইসোট্রপিক না হবার তুলনায় ১,২০,০০০ গুণ। আবার অ্যাস্ট্রোফিজিকেল জার্নাল লেটারস জার্নালের একটি গবেষণা বলছে, মহাবিশ্ব সুষম (homogeneous) হবার সম্ভাবনা ৯৫%। মানে বড় মাপকাঠিতে মহাবিশ্বের আলাদা আলাদা অংশ একই রকম। আইসোট্রোপিক কথাটা একটু ভিন্ন। এটি অনুসারে আমরা মহাবিশ্বের যেদিকেই তাকাই এই রকম চিত্র দেখবো। অবশ্যই বড় মাপকাঠিতে। ঠিক যেমন একটি বিশাল ঘন বনে যেদিকেই তাকাই, মোটামুটি একই চিত্র দেখা যাবে।

এসব গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহাবিশ্ব সুষম ও অঘূর্ণনশীল। এ ধারণা সহজে বদলে যাবার মতো বিষয়ও নয়। ভবিষ্যতে সিএমবি এর উপাত্ত ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া আরও উন্নত হবে অবশ্যই। তবে মহাবিশ্বের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো না বদলানোই বেশি স্বাভাবিক।

তবে ২০১১ সালে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছিল। নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ফিজিক্স লেটার্স জার্নালে। নিবন্ধের গবেষকরা ১৫ হাজারের বেশি ছায়াপথ নিয়ে কাজ করেছিলেন। এ থেকে তাঁদের দাবি ছিল, মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল ঘুরন্ত অবস্থায়, যা চলছে আজ অবধি। সে ঘূর্ণন চলছে নির্দিষ্ট একটি কক্ষকে ঘিরে। অর্থাৎ, প্রাথমিক মহাবিশ্বও একটি নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরত।

প্রধান গবেষক লোংগো ও তার দল ১৫,১৫৮টি ছায়াপথ নিয়ে কাজ করেছিলেন। দেখা গেল, বেশিরভাগ ছায়াপথ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরছে। লোংগোর মতে এটা কোনো দৈব ঘটনা হতে পারে না। ছায়াপথরা একটি নির্দিষ্ট দিকে ঘোরার অর্থ হবে মহাবিশ্বের একটি নেট কৌণিক ভরবেগ থাকবে। আর কৌণিক ভরবেগ যেহেতু সংরক্ষিত থাকার কথা, তাই মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই ঘুরন্ত অবস্থায় জন্ম নিয়েছিল।

লোংগোর মতে, আমরা যদি দেখাতে পারি মহাবিশ্বে এখনও প্রাথমিক কৌণিক ভরবেগ বজায় আছে, তাহলে বোঝা যাবে আমাদের মহাবিশ্ব অন্য কোনো বড় জায়গার মধ্যে অবস্থিত। এবং এটি ঘুরছে। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে প্রাথমিক এই কৌণিক ভরবেগ ছড়িয়ে গিয়েছিল বস্তুপিণ্ডের মধ্যে। যার কারণেই হয়ত ছায়াপথরা নির্দিষ্ট দিকে ঘুরছে। অন্য কারণেও ছায়াপথ নির্দিষ্ট দিকে হয়ত ঘুরতে পারে, তবে ঘুরন্ত প্রাথমিক মহাবিশ্ব দিয়েই ব্যাখ্যাটা সরল হয়। আর সরল ব্যাখ্যাই বিজ্ঞান সব সময় বেশি পছন্দ করে।

দলটি একই গবেষণা উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের ছায়াপথ নিয়ে করেছেন। আগেই আমরা বলেছি, ঘূর্ণনের দিক নির্ভর করে আমরা কোন দিক থেকে দেখছি তার ওপর। তারা দেখেছেন, দক্ষিণ গোলার্ধে আবার ডানাবর্তী বা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরা ছায়াপথের সংখ্যা প্রায় একই পরিমাণ বেশি। তিনি ও তাঁর দল বর্তমানে আরও বেশি উপাত্ত নিয়ে কাজ করছেন।

তবে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্পদার্থবিদ নিটা বাকল বলছেন, ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের পক্ষে শক্ত কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর মতে ছায়াপথের ঘূর্ণন স্থানীয় কোনো মহাকর্ষীয় প্রভাবে হওয়া খুবই সম্ভব। ফলে মহাবিশ্বের ঘূর্ণনের এই মতটি ২০১৬ সালের গবেষণার চেয়ে একটু দুর্বল।

আরেকটি বিষয় হলো, মহাবিশ্বের ভেতরের বস্তু নিয়ে গবেষণা পুরো মহাবিশ্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া আসলেই কঠিন। মহাবিশ্ব নিজে এর ভেতরের নিয়ম মানতে বাধ্য নয়। যে কারণে ছায়াপথরা আপাতদৃষ্টিতে আপেক্ষিকতার নিয়ম ভেঙে আলোর চেয়ে জোরে পরস্পর থেকে দূরে সরে। আসলে ছায়াপথরা তো দূরে সরে স্থান-কালের প্রসারণের কারণে। প্রসারণগতি ছায়াপথদের নিজেদের গতি নয়। আর স্থান-কাল নিজে আপেক্ষিকতা মানতে বাধ্য নয়।

তবে অঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের ধারণায় রোমাঞ্চের যথেষ্ট অভাব। সেক্ষেত্রে একটু ভেবে দেখা যাক, কোনোভাবে মহাবিশ্বকে ঘোরানো যায় কিনা। মজার ব্যাপার হলো মহাবিশ্বের সেই ক্ষেত্র সমীকরণগুলো থেকে ঘুরন্ত মহাবিশ্বেরও সমাধান পাওয়া সম্ভব। একে বলা হয় গোদেলের মহাবিশ্ব। গণিতবিদ কার্ট গোদেল আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে ঘুরন্ত মহাবিশ্বটি বের করেন।

এ সমাধান থেকে দেখা গেল, নতুন ধরনের একটি স্থান- কাল পাওয়া যাচ্ছে। আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে অনেকগুলো গাণিতিক মডেল বের করা যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এর সবগুলো সমাধানই আমাদের মহাবিশ্বের জন্যে প্রযোজ্য। এই মডেলগুলো যা বলছে তা বাস্তব পর্যবেক্ষণের সাথে মিলিয়ে নিয়ে আমরা বুঝতে পারব যে এগুলো আমাদের মহাবিশ্বের জন্যে চলবে কি না। তবে চলবে কি না সেটা তো যাচাইয়ের ব্যাপার। মজার ব্যাপার হলো, কার্ট গোদেলএই সমাধান বের করার মাধ্যমে পদার্থবিদ্যার সূত্র ব্যবহার করে অতীতে ভ্রমণ করার সম্ভাবনা সবার আগে খুঁজে পান।

কিন্তু পুরো মহাবিশ্বই আবর্তিত হচ্ছে- এই কথার মানে কী? আবর্তিত হবার মানে হল, কোনো স্থির প্রসঙ্গ বিন্দুর উপস্থিতি যাকে কেন্দ্র করে বস্তুটি ঘুরবে। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, ‘কিসের সাপেক্ষে ঘুরছে?’ উত্তরটা হবে একটু গুরুগম্ভীর। মূলত ছোট্ট লাটিম বা জাইরোস্কোপের মুখ যেদিকে থাকে, দূরের বস্তুগুলো মহাবিশ্বের মধ্যে সেদিকে মুখ করে ঘুরবে। গোদেলের স্থান- কালে গাণিতিকভাবে এতে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। আপনি যদি পৃথিবী থেকে অনেক দূর ভ্রমণ করে আবার ফিরে আসেন, তবে সম্ভাবনা আছে যে আপনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন রওনা দেবার আগের কোনো সময়ে!

নিজের সমীকরণ থেকে এই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বলে আইনস্টাইন খুব হতাশ হয়েছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব কখনো টাইম ট্র্যাভেল বা সময় ভ্রমণের সুযোগ রাখবে না। কিন্তু যদিও গোদেলের সমাধান আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকেই এসেছে, তবু এটি আসলে আমাদের মহাবিশ্বের জন্যে খাটবে না। কারণ, পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা জানি যে আমাদের মহাবিশ্ব ঘুরছে না (আবর্তন করছে না), বা করলেও তা খুব নগণ্য।

ফলে অরোনাঞ্চকর হলেও আপাতত ঘূর্ণনবিহীন মহাবিশ্বেই থাকতে হবে আমাদেরকে!

সূত্র: লাইভসায়েন্স ডট কম, ফিজিক্সওয়ার্ল্ড ডট কম, অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম, নাশ্যনাল জিওগ্রাফিক, কর্নেল ডট এজু, সায়েন্টিফিক আমেরিকান।

* <https://www.livescience.com/65882-does-the-universe-rotate.html>
* <https://physicsworld.com/a/was-the-universe-born-spinning/>
* <https://en.wikipedia.org/wiki/Uranus#Orbit_and_rotation>
* <https://en.wikipedia.org/wiki/Rotation_period#Rotation_period_of_selected_objects>
* http://science.howstuffworks.com/dictionary/astronomy-terms/galaxy3.htm
* <https://news.nationalgeographic.com/news/2007/04/070420-extinctions_2.html>
* <http://curious.astro.cornell.edu/the-universe/94-the-milky-way/dynamics/482-does-the-milky-way-spin-counter-clockwise-if-so-do-all-spiral-galaxies-spin-in-this-direction-and-why-beginner>
* <https://arxiv.org/pdf/0803.3247.pdf>
* <https://www.physicsforums.com/threads/does-nucleus-in-an-atom-spin.742167/>
* <https://www.quora.com/Is-it-possible-that-atoms-are-tiny-universes-whose-quarks-are-billions-of-galaxies-And-our-universe-is-an-atom-to-infinitely-larger-universes>
* <http://www.applet-magic.com/nuclearrot5.htm>
* <https://www.quora.com/Is-it-possible-that-atoms-are-tiny-universes-whose-quarks-are-billions-of-galaxies-And-our-universe-is-an-atom-to-infinitely-larger-universes>
* <https://www.scientificamerican.com/article/what-exactly-is-the-spin/>

মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতি

গত শতকে আমরা জানতে পারি, মহাবিশ্বের একটি নির্দিষ্ট অতীত আছে। তার আগে স্থির অবস্থা তত্ত্ব জনপ্রিয় ছিল। ধারণা করা হত, মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে উপস্থিত আছে। বয়স অনন্ত হলে ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন আসে না। কিন্তু কবির কথা, “জন্মিলে মরিতে হবে।“ তাই অতীত নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হলে ভবিষ্যতে কী হবে সেটা বড় এক প্রশ্ন।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৫০। এই বিশ বছর ধরে বিজ্ঞানী এডউইন হাবলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝা গেল, ছায়াপথরা একে অপর থেকে দূরে সরছে। এ পর্যবেক্ষণের ফলাফল থেকেই তৈরি হয় বিগ ব্যাং তত্ত্ব। ১৯২৭ সালে জর্জ লেমেইত্র বলেন, প্রসারণশীল মহাবিশ্ব থেকে বলা যায়, অতীতে মহাবিশ্ব ছিল নিবিড় এক বিন্দুর মতো। এর আগে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের সমাধান করে আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যানও একই কথা বলেছিলেন। আইনস্টাইনের সমীকরণের একটি সমাধান অনুসারে দেখা যায়, একটি প্রাথমিক সিংগুলারিটি থেকে জন্ম মহাবিশ্বের। ১৯৬৪ সালে আবিষ্কৃত হয় মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ। বিগ ব্যাংয়ের পক্ষে একটি বড় প্রমাণ সেটি।

১৯৯৮ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি ক্রমেই বাড়ছে। এর জন্য দায়ী শক্তিকে নাম দেওয়া হয় ডার্ক এনার্জি। আইনস্টাইনের সমীকরণ বলছিল, মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন নিজেই সেটা বিশ্বাস করতেন না। সমীকরণ অসম্পূর্ণ মনে করে তিনি তাই বাড়তি একটি ধ্রুবক যোগ করেছিলেন। পরে স্বীকার করেন, এটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু মহাবিশ্বের প্রসারণের গতি ক্রমেই বাড়ছে দেখে এখন আবার মনে হচ্ছে এই ধ্রুবক দরকার আছে। মানে ধ্রুবকের মান শূন্য নয়। এই ধ্রুবক আসলে ডার্ক এনার্জির বিপরীতে কাজ করে। চায় মহাবিশ্বের প্রসারণ আটকে দিতে।

মোটা দাগে বললে ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের ভাগ্যে তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে। হয় এটি চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। মহাকর্ষ প্রসারণের গতি কমানোর চেষ্টা করবে। তবে ডার্ক এনার্জির কারণে প্রসারণের গতি ক্রমেই বাড়বে। আরেকটি হতে পারে, মহাবিশ্বের প্রসারণ এক সময় থেমে যাবে। শুরু হবে সঙ্কোচন। আর তৃতীয় সম্ভাবনা হলো, প্রসারণ চলতে থাকবে। তবে প্রসারণের গতি ক্রমশ কমতে থাকবে। কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না।

ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের ভাগ্যে কী ঘটবে তার বড় একটি প্রভাবক হলো মহাবিশ্বের ঘনত্ব পরামিতি (density parameter)। একে গ্রিক বর্ণ ওমেগা (Ω) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর মান পেতে মহাবিশ্বের বস্তুর গড় ঘনত্বকে ঘনত্বের একটি ক্রান্তি মান দ্বারা ভাগ করা হয়। ঘনত্বের যে মান খুব অল্পের জন্য মহাবিশ্বের প্রসারণকে থামাতে ব্যর্থ হবে তার নাম ক্রান্তি (critical) ঘনত্ব।

মহাবিশ্বের ভবিষ্যতের সাথে এর আকৃতিরও সম্পর্ক আছে। ওমেগার মান ১-এর বেশি হলে মহাবিশ্বের আকৃতি হবে আবদ্ধ গোলকের পৃষ্ঠের মতো। কারণ এক্ষেত্রে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রান্তি ঘনত্বের চেয়ে বেশি। পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতো এমন মহাবিশ্বের ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির বেশি হবে। তবে বড় মাপকাঠিতে মহাবিশ্বের আকৃতি হবে উপবৃত্তের মতো। মহাকর্ষের প্রভাবে এক সময় প্রসারণ থেমে যাবে। শেষ পর্যন্ত ঘটবে বিগ ক্রাঞ্চ (Big Crunch) বা মহাসঙ্কোচন। বিন্দু থেকে আসা মহাবিশ্ব বিন্দুতে গিয়েই আবার মিশে যাবে।

তবে কিছু কিছু আধুনিক তত্ত্ব বলছে, ওমেগার মান ১-এর বেশি হলেও ডার্ক এনার্জির প্রভাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতেই থাকবে। এ কারণে মহাসঙ্কোচন ঘটার সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কম। তবে ঘটবেই না সেটা বলার জো নেই।

ওমেগার মান ১-এর কম হলে মহাবিশ্ব হবে উন্মুক্ত। ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রির কম হবে। মহাকর্ষ প্রসারণকে কিছুটা কমাবে। কিন্তু ডার্ক এনার্জির প্রভাবে সে বাধা উপেক্ষা করে প্রসারণের গতি বরং আরও বেড়ে যেতে থাকবে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় মহাকর্ষ, তড়িচ্চুমকত্ব ও সবল নিউক্লীয় বলের বাঁধন ছিঁড়ে যাবে। এ অবস্থাকে বলা হয় বিগ রিপ (Big Rip) বা মহাভাঙন।

একই রকম পরিস্থিতিতে আরেকটি সম্ভাব্য পরিণতির নাম বিগ ফ্রিজ (Big Freeze) বা মহাহিমায়ন। এ অবস্থায় সর্বত্র বিরাজ করবে হিমশীতল অবস্থা। হবে না কোনোরকম তাপ বিনিময়। থেমে যাব বস্তুকণার চলাচল। এ কারণে এর অপর নাম তাপীর মৃত্যু। এটা ঘটে গেলে বস্তুর মধ্যে আর কোনো প্রকার তাপ বিনিময় সম্ভব হবে না। সব যন্ত্র অচল হয়ে যাবে। এনট্রপি (শক্তি রূপান্তরের অক্ষমতা) হবে সর্বোচ্চ।

তবে মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রান্তি ঘনত্বের সমানও হয়ে যেতে পারে। সত্যি বলতে, বর্তমান পর্যবেক্ষণ এর পক্ষেই কথা বলছে। এমন মহাবিশ্বেই ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রি হয়। এক্ষেত্রে মহাবিশ্ব হবে সমতল। পর্যবেক্ষণ বলছে, মহাবিশ্ব এমনই। এই ফলাফলের ত্রুটির মাত্রা মাত্র ০.৪%। এই মহাবিশ্বও চিরকাল প্রসারিত হবে, তবে প্রসারণের হার ক্রমশ কমবে। তবে কখনোই একেবারে থেমে যাবে না। তবে ডার্ক এনার্জি ভূমিকা রাখলে প্রসারণ শুরুতে থামলেও আবার বেড়ে যাবে। পরিণতি হবে সেই উন্মুক্ত মহাবিশ্বের মতোই।

আরও কিছু কমসম্ভাব্য ঘটনাও ঘটতে পারে মহজাবিশ্বের ভাগ্যে। এর একটি হলো বিগ বাউন্স। এটা আসলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে চক্রাকার মডেলের একটি অংশ। এটি অনুসারে, মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল সঙ্কুচিত অবস্থা থেকে। আর সেই সঙ্কুচিত অবস্থাটা এসেছিল তার পূর্ববর্তী একটি প্রসারণ থেমে গিয়ে গুটিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। এভাবেই মহাবিশ্ব একের পর সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। একের পর ঘটছে বিগ ব্যাং ও বিগ ক্রাঞ্চ। এ জন্যেই এই মডেলের নাম চক্রাকার মডেল।

বিজ্ঞানীরা বলছেন আরও একটি সম্ভাবনার কথা। এর নাম বিগ স্লার্প (Big Slurp)। স্লার্প অর্থ গ্রাস করা বা গ্রাস করার সময় সৃষ্ট শব্দ। এ তত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্ব এখন নকল ভ্যাকুয়াম অবস্থায় আছে। যেকোনো সময় চলে যেতে পারে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে। প্রকৃতির যেকোনো ভৌত প্রক্রিয়া সবসময় সর্বিনিম্নের শক্তির অবস্থানে থাকতে চায়। আর মহাবিশ্ব সর্বনিম্ন শক্তির অবস্থায় থাকলেই কেবল প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে থাকবে। এখন সেটা নাও হতে পারে। হয়ত মহাবিশ্ব এখন উচ্চতর শক্তির অবস্থানে আছে। তার মানে আছে নকল ভ্যাকুয়াম অবস্থায়। সেক্ষেত্রে যেকোনো সময় এটি আসল ভ্যাকুয়ামে চলে যাবে। তার সাথে সাথে আমূল পাল্টে যাবে আমাদের চিরচেনা মহাবিশ্ব। ভৌত ধ্রুবকদের মান বদলে যেতে পারে। পাল্টে যেতে পারে আলোর বেগ কিংবা অ্যাভোগেড্রো ধ্রুবকের মান। ফলে স্থান, কাল, বস্তু ও শক্তির ধারণা একদম বদলে যেতে পারে। হয়ত আগাম কোনো সঙ্কেত না দিয়েই ধ্বংস হয়ে যাবে মহাবিশ্ব।

সময় কেন পেছনে চলে না?

ধরুন আপনার সামনে হঠৎ করে একটি ডিম ভেঙে গেল। ডিমটার জন্যে আপনার খুব মায়া হল। ইচ্ছা হল, একে আবার জোড়া লাগিয়ে ফেলতে। কিন্তু চাইলেই কি কাজটি সহজে করে ফেলা সম্ভব? আসলে ভাঙা ডিম জোড়া লাগানোর সমস্যা নিছক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে মহাবিশ্বের জন্ম কৌশলও।

কখনও ভেবে দেখেছেন, একটি কত সহজে- একটি ডিম সেকেন্ডের মধ্যেই ভেঙে ফেলা যায়। অথচ, উল্টো কাজটি কেন এত সহজে করা যায় না? কাজ কি আসলে খুব বেশি? ডিমের খোলস, কুসুম আর সাদা অংশটুকুইতো জোড়া লাগাতে হবে, ব্যস! কিন্তু বলা যত সহজ, কাজটা মোটেই ততটা সহজ নয়। কিন্তু কেন? প্রকৃতির কোনো সূত্র কি ডিমকে জোড়া লাগতে বাধা দেয়? কাজটা কি আসলেই অসম্ভব?

না। পদার্থবিদ্যা বরং বলছে, আামাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ঘটতে পারে উল্টো দিকেও। সময়ের গতিকে পেছনের দিকে চিন্তা করলেও। কিন্তু তবু কেন আমরা ভাঙা ডিম বা চায়ের কাপ জোড়া লাগাতে ব্যর্থ? ঘটনাগুলো কেন পেছন দিকে চলে না, সব সময় চলতে থাকে ভবিষ্যতের পানে? প্রশ্নটিকে খুবই সাদামাটা মনে হয়। কিন্তু এর উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে চলে যেতে হবে মহাবিশ্বের জন্মের সময় পর্যন্ত, যেতে হবে পরমাণুর ক্ষুদ্র জগতেও।

অন্য অনেক ঘটনার মতোই এখানেও শুরুতে চলে আসবে নিউটনের কথা। ১৬৬৬ সালে প্লেগের কবলে পড়ে তাঁকে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসতে হয় লিংকনশায়ার গ্রামে তাঁর মায়ের কাছে। বিরক্তি ও একাকীত্ব নিউটনকে পদার্থবিদ্যা নিয়ে গভীর ভাবনার সুযোগ করে দেয়। ফসল, তিনটি গতির সূত্র এবং মহাকর্ষ সূত্র। দৈনন্দিন পৃথিবীর পরিচিত বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যায় অবিশ্বাস্য রকম সফল তাঁর সূত্রগুলো। আপেল কেন মাটিতে পড়ে, পৃথিবী কেন সূর্যের চারদিকে ঘোরে তা জানা হয়ে গেল। তবে সূত্রগুলোর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। আপনি যদি সময়কে উল্টো দিকেও চিন্তা করেন, যেমন ধরুন পৃথিবী এখন সূর্যের চারদিকে যেভাবে ঘুরছে তার উল্টো দিকে ঘুরতে লাগল, মানে পেছন দিকে চলতে থাকল, অথবা, পশ্চিম থেকে পূবের বদলে পৃথিবী আবর্তন করতে থাকল পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে, যার ফলাফল হত সূর্য উঠবে পশ্চিমে আর ডুববে পূবে, তবুও নিউটনের সূত্রগুলো কাজ করে আগের মতোই। ফলে নিউটনের সূত্র অনুসারে ভাঙা ডিমও জোড়া লাগতে পারে।

এটি ভালো একটি সমস্যা। কিন্তু আরও সমস্যা হল, নিউটনের পরেও বিভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানীরা যে সূত্রগুলো আবিষ্কার করেছেন, তাদের প্রায় সবগুলোর একই সমস্যা। সময় বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছে, নাকি অতীতের দিকে তার কোনো গুরুত্বই নেই সূত্রগুলোর কাছে। এরা বরং গুরুত্বের সাথে দেখে যে আপনি কি বামহাতী নাকি ডানহাতী। কিন্তু আমরাতো সূত্রদের মতো নই। আমাদের কাছে সময়ের অতীতের বা ভবিষ্যতের দিকের প্রবাহের ফল তো এক নয়।

এই সমস্যাটিকে সবার আগে গুরুত্বের সাথে নেন অস্ট্রিয় পদার্থবিদ লুডভিগ বোলজম্যান। তিনি ঊনবিংশ শতকের মানুষ। এখন আমরা যা জানি তার অনেক কিছুই তখন ছিল বিতর্কের বিষয়। এমনকি সব কিছু যে পরমাণু দিয়ে গঠিত- এই কথায়ও সকল পদার্থবিদের জানা ছিল না তখন। সে সময় অবস্থা এমন ছিল যে পরমাণুর ধারণা যাচাই করারও কোনো উপায় ছিল না।

বোলজম্যানের বিশ্বাস ছিল পরমাণুর অস্তিত্ব আছে। ফলে তিনি এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সব কিছুর ব্যাখ্যা দিকে চেষ্টা করলেন। যেমন, আগুন কেন জ্বলে, আমাদের ফুসফুস কীভাবে কাজ করে, বা বাতাস পেলে চা কেন ঠাÐা হয়ে যায় ইত্যাদি। তার বিশ্বাস জন্মাল, তিনি পরমাণুর ধারণা কাজে লাগিয়েই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবেন। তার কথায় আস্থা রাখলেন অল্প কিছু বিজ্ঞানী। বাকিরা তাকে পরিত্যাগ করে একঘরে করে ফেলল।

তিনি থেমে থাকলেন না। প্রথমে ভাবলেন উত্তপ্ত পানি নিয়ে। প্রথমে মনে হতে পারে, এমন চিন্তার সাথে সময়ের সম্পর্ক কী? কিন্তু বোলজম্যানের গবেষণা থেকে জানা যাবে যে একের সাথে অন্যের সম্পর্ক আছে।

ঐ সময়েই পদার্থবিদ্যার জগতে প্রবেশ করল তাপগতিবিদ্যার ধারণা। এটি ব্যাখ্যা করে তাপের গতি প্রকৃতি। তাপগতিবিদ্যার কারণেই বর্তমানে আমরা বুঝতে পারি ফ্রিজ কীভাবে গরম খাবারকে ঠান্ডা করে। সে সময় বোলজম্যানের বিরোধীরা ভেবেছিল, তাপকে অন্য কিছু দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাপ শুধুই তাপ, অন্য কিছু নয়। এ ধারণা দূর করতে কাজে লেগে পড়লেন তিনি।

তিনি ভাবলেন, তাপ উৎপন্ন হয় বস্তুর অভ্যন্তরে থাকা পরমাণুর এলোমেলো গতির ফলে। আর তাপগতিবিদ্যাকেও এসব পরমাণুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তিনি সম্পূর্ণ সঠিক হলেও বাকি জীবনটা কেটে গেলে এই ধারণা অন্যদের বোঝাতে বোঝাতে। তিনি শুরুতে এনট্রপির ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেন। তাপগতিবিদ্যা অনুসারে জগতের সব বস্তুর মধ্যেই কিছু না কিছু এনট্রপি জড়িয়ে আছে। যখনই এতে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে, এর এনট্রপি বেড়ে যায়। যেমন আপনি যদি একটি গøাসের মধ্যে একটি আইস কিউব ডুবিয়ে একে গলতে দেন, তবে গøাসের এনট্রপি বেড়ে যাবে। মূলত এনট্রপি হল, এলোমেলো অবস্থার একটি পারিমাপ। যে সিস্টেম যত এলামেলো তার এনট্রপি তত বেশি। একটি সাজানো গোছানো রুমের মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলে খেলাধূলা করতে থাকলে একটু পরই রুমের এনট্রপি বেড়ে যাবে।

এনট্রপির বৃদ্ধিকে পদার্থবিদ্যার অন্য কিছুর সাথে মেলানো যায় না। এটা শুধু এক দিকেই চলতে পারে। এনট্রপি কখনও কমে না, সম সময় বেড়ে চলে দুর্বার গতিতে। কেউ জানে না, কেন।

বোলজম্যানের সহকর্মীরা আবারও ভাবলেন, এনট্রপির এই বৃদ্ধিকে অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বোলজম্যান মানলেন না। নেমে পড়লেন কারণ অনুসন্ধানে। ফলাফল হিসেবে আমরা পেলাম এনট্রপির সম্পূর্ণ নতুন এক জ্ঞান। এটা এমনই যুগান্তকারী ছিল যে তার সমাধিতেও লিখে রাখা হয় তার আবিষ্কৃত সূত্রখানা।

তিনি আবিষ্কার করলেন, একটি বস্তুতে যে শক্তি এবং পরমাণুগুলো আছে তাদেরকে যত উপায়ে বিন্যস্ত করা যায় তারই একটি পরিমাপ হল এনট্রপি। এনট্রপি বেড়ে যাবার অর্থ হল বস্তুর অভ্যন্তরে পরমাণুগুলো আরো বেশি এলোমেলো বা অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর মতে, এ কারণেই পানিতে রাখলে বরফ গলে যায়। পানি যখন তরলে পরিণত হয়, তখন কঠিন অবস্থার তুলনায় এর অণুগুলোর বিন্যস্ত হবার উপায় অনেক বেড়ে যায়। আর অণুগুলোর মধ্যে বিনিময়কৃত তাপ শক্তিও আরও বেশি উপায়ে সজ্জিত হবার সুযোগ পায়। বরফ কঠিন অবস্থায় থাকার চেয়ে তরল অবস্থায় চলে যাবার জন্যে অনেক বেশি উপায় খুঁজে পায়।

একইভাবে আপনি যদি কফির কাপে একটু ক্রিম ঢেলে দেন, এটি পুরো কাপে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ সেটাই হল অধিক এনট্রপির অবস্থা। এই ক্রিম একটি জায়গায় থাকার বদলে ছড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বেশি সংখ্যক উপায়ে বিন্যস্ত হতে পারে। বোলজম্যানের মতে এনট্রপি হল একটি সম্ভাবনা। অল্প এনট্রপির বস্তু সুবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে বলে সে রকম থাকার সম্ভাবনা কম। বেশি এনট্রপির বস্তু তুলনামূলকভাবে অপরিচ্ছন্ন বা অবিন্যস্ত থাকে বলে তার সম্ভাবনা বেশি। এনট্রপি সব সময় বাড়ে, কারণ বস্তুর জন্য অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকা সহজ।

মজার বিষয় হল, এই এনট্রপির মাধ্যমে অ্যারো অব টাইম বা সময়ের সামনে চলাকে ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু পুরো মহাবিশ্বের এনট্রপি সব সময় বেড়ে চলেছে, তাই কোনো ঘটনাকে পেছন দিকে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

আমরা ডিমকে জোড়া লাগতে দেখি না, কারণ ভাঙা অংশগুলো বিন্যস্ত করার অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন উপায় আছে, যার প্রায় সবগুলোই আবার ভাঙা ডিমই ফিরিয়ে দেবে। এনট্রপির ব্যাখ্যা থেকে আমরা এটাও ব্যাখ্যা করতে পারি যে কেন আমরা অতীতকে মনে রাখতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতকে নয়। ভাবুন তো কেমন হত যদি আপনার স্মৃতিতে একটি ঘটনা গাঁথা আছে। ঘটনাটি ঘটল তার পরে। এর পর আপনি স্মৃতি হারিয়ে ফেললেন। আপনার মস্তিষ্কে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা বেশ কম। বোলজম্যানের মতে, অতীত থেকে ভবিষ্যতকে আলাদা মনে হয়, কারণ জগতের এনট্রপি বাড়ছে। নাছোড়বান্দা শত্রুরা কিন্তু এতে একটি খুঁত পেয়ে গেলেন।

বোলজম্যান বলেছিলেন, ভবিষ্যতে যেতে থাকলে এনট্রপি বাড়ার কারণ হল বস্তুর মধ্যে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর আচরণের সম্ভাবনা। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুরাতো পদার্থবিদ্যার নিয়মের বাইরে যেতে পারবে না। আর সেই নিয়ম মতেতো অতীত আর ভবিষ্যতে নেই কোনো বিভেদ। তাহলেতো ভবিষ্যতে গেলে যেমন এনট্রপি বাড়বে, তেমনি বাড়বে অতীতে এগলেও।

এর সমাধান করতে বোলজম্যান কয়েকটি উপায়ের কথা বলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে সেরাটি হল পাস্ট হাইপোথিসিস। এটি অনুসারে, কোনো এক দূর অতীতে মহাবিশ্বের এনট্রপি ছিল খুবই কম। এটি সঠিক হলে তার যুক্তির খুঁতটি আর থাকে না। অতীত ও ভবিষ্যতকে ভিন্ন দেখায়, কারণ ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের এনট্রপি অনেক কম। ফলে ডিম ভাঙে, জোড়া লাগে না। কিন্তু এই ব্যাখ্যা তৈরি করে আরেকটি নতুন সমস্যা। স্বল্প এনট্রপি থাকা যদি কঠিনই হয় তাহলে দূর অতীতেই এত কম এনট্রপি ছিল কেন?

এ সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারলেন না। ভাবলেন, ভবিষ্যতের পদার্থবিজ্ঞান তাকে অচিরেই ভুলে যাবে। হতাশ হয়ে ১৯০৬ সালে তিনি নিজেকে রশিতে ঝুলিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। তিনি যদি আর মাত্র এক দশক বেচেঁ থাকতেন, তবেই নিজের ধারণার সাফল্য দেখে যেতে পারতেন। পদার্থবিদরা তাঁর দেওয়া পরমাণুর ধারণা মেনে নিলেন। নতুন আবিষ্কার থেকে এও দেখা গেল যে পাস্ট হাইপোথিসিসের পক্ষেও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

বিংশ শতকে এসে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা গেল পাল্টে। জানা গেল, মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে। বোলজম্যানের সময়কালে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস ছিল, আমাদের মহাবিশ চিরন্তন ও স্থির, যার কোনো শুরু বা শেষ নেই। কিন্তু ১৯২০ এর দশকে এসে দেখা গেল এয অধকাংশ গ্যালাক্সি আমাদের থেকে দƒরে সরছে। আস্তে আএ’¦ প্রমাণ দাঁড়িয়ে গেল, মহাবিশ্ব স¤প্রসারিত হচ্ছে এবং এক সময় সব কিছু খুব কাছাকাছি ছিল। পরের দশকগুলোতে জানা হয়ে গেল যে একটি অতি উত্তপ্ত ও ঘনীভূত অবস্থা থেকে জন্ম হয়েছে মহাবিশ্বের। এক সময় এটি প্রসারণের ফলে শীতল হতে হতে আজকের এ অবস্থায় এসেছে।

একে পা’¡ হাইপোথিসিসের পক্ষে একটি প্রমাণ মনে হল। বলা হল, আচ্ছা, ঠিক আছে। আদি মহাবিশ্বের এনট্রপি তাহলে অনেক কম ছিল। তবে ১৪ শ কোটি বছর আগের সেই সময়টিতে কেন এনট্রপি কম ছিল তা জানা গেল না। মনে হওয়া অতি স্বাভাবিক যে মহাবিশ্বের আদি বিস্ফোরণ ও প্রসারণের সাথে নিম্ন এনট্রপির সম্পর্ক কী? বিস্ফোরণতো বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করে। তাছাড়া সেই আদি ও উত্তপ্ত অবস্থায়তো পদার্থ ও শক্তির বিন্যস্ত হবার বহু ভিন্ন উপায় থাকার কথা।

একটি বিশাল শূন্য স্থানের কথা বল্পনা করুন, যার কেন্দে আছে সূর্যের ভরের সমান একটি গ্যাসীয় মেঘ। মহাকর্ষেও আকর্ষণে গ্যাসগুলো ক্রমশ জড় হয়ে পরিণত হবে নক্ষত্রে। এনট্রপি যদি সব সময় বেড়েই চলে, তাহলে এটি কী করে সম্ভব? গ্যাসগুলো যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তখনইতো বরং এরা বেশি সংখ্যক উপায়ে বিন্যস্ত হতে পারত।

গুচ্ছবদ্ধ থাকার গুরুত্ব

আসলে মহাকর্ষ এনট্রপিকে এমন একটি উপায়ে প্রভাবিত করে, যা বিজ্ঞানীরা এখনও ভালোভাবে জানতে পারেননি। বেশি ভারী বস্তুদের ক্ষেত্রে ঘন ও সুষম থাকার চেয়ে গুচ্ছবদ্ধ থাকলেই এনট্রপি বেশি হয়। ফলে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র ও গ্রহদের মহাবিশ্বের এনট্রপি উত্তপ্ত ও ঘনীভূত মহাবিশ্বের চেয়ে বেশি। সমস্যা কি তাহলে শেষ হল? জর্জ বার্নাড শ একবার বলেছিলেন, বিজ্ঞান একটি সমস্যার সমাধান করে আরও দশটি নতুন সমস্যা তৈরি করে।

এখানেও তাই। বিগ ব্যাংয়ের সময়কালের সেই উত্তপ্ত ও ঘন মহাবিশ্বের এনট্রপি কম থাকায় এমন অবস্থায় মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনাতো খুব কম। তাহলে এমন একটি অনিশ্চিত অবস্থা নিয়ে মহাবিশ্বের জন্মই বা কীভাবে হল? একটি ব্যাখ্যা হতে পাওে, বিগ ব্যাং এর আগেও কিছু একটা ছিল, যা আদি মহাবিশ্বের এনট্রপির স্বল্পতার জন্য দায়ী।

কসমোলজিস্ট শন ক্যারোল ও তাঁর এক সাবেক ছাত্রের মতে প্রতিনিয়ত মূল একটি মহাবিশ্ব থেকে শিশু মহাবিশ্বদের জন্ম হচ্ছে, যারা প্রসারিত হয়ে আমাদের মহাবিশ্বের রূপ নিচ্ছে। এই শিশু মহাবিশ্বরা কম এনট্রপি নিয়েও থাকতে পারে। বিন্তু মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্বের সামগ্রিক এনট্রপি সব সময় বেশিই থাকবে। এটা সত্য হলে এর অর্থ হবে, মহাবিশ্বের এনট্রপি কম মনে হবার কারণ হল, আমরা বড় চিত্রটি দেখছি না। এটা সত্য অ্যারো অব টাইমের জন্যেও। ক্যারোলের মতে, অনেক দূরের অতীত অনেক দূরের ভবিষ্যতের মতোই দেখাবে। তবে ক্যারোলের এই মতটি সার্বজনীন নয়।

এর একটি সমস্যা হল আমাদের চেনাজানা পদার্থবিদ্যার সেরা সূত্রগুলোও বিগ ব্যাং পর্যন্ত গিয়ে অচল। মহাবিশ্বের আদি সূচনা কী করে হয়েছিল তা বুঝতে না পারলে এর নিম্ন এনট্রপির ব্যাখ্যাও পাওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের দুই প্রধান স্তম্ভ কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত¡। প্রথমটির কাজ পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র জিনিসদের নিয়ে, আর পরেরটির কাজ হল গ্রহ, নক্ষত্র বা তার চেয়ে বড় বস্তুদের নিয়ে। কিন্তু দুটোকে ঐকতানে আনা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আদি মহাবিশ্বকে বুঝতে হলে দুটোকে মিলিয়ে একটি সার্বিক তত্ত¡ বা থিওরি অব এভরিথিং তৈরি করতেই হবে।

অ্যারো অব টাইমের ব্যাখ্যা পেতে তাই সেই চূড়ান্ত সূত্রটির বড় দরকার। কিন্তু সেই সূত্র বহু দিন ধরে সোনার হরিণ হয়ে আছে। চৃড়ান্ত সেই সূত্রের কিছু প্রস্তাবনার মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হল স্ট্রিং থিওরি। এই তত্ত¡ অনুসারে, অতিপারমাণবিক কণিকারা আসলে স্ট্রিংয়ের কম্পন মাত্র। এই তত্তে¡র আরও বক্তব্য হল আমাদের চেনা তিন মাত্রার চেয়ে বাস্তবে মাত্রা আছে আরো বেশি, যেগুলো খুব ক্ষুদ্র জায়গায় পেঁিচয়ে আছে। আরেকটি বক্তব্য হলো, মহাবিশ্ব আছে বহু, যার প্রতিটিতে হয়ত কাজ করে আলাদা আলাদা সূত্র। কিন্তু সময় সামনে চলার ব্যাখ্যা নেই এখানেও। পদার্থবিদ্যার অন্য মৌলিক সূত্রের মতো এটিও অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না।

ফলে অ্যারো অব টাইমের ব্যাখ্যা পাবার ব্যাপারে স্ট্রিং থিওরির ওপরও নির্ভর করা যাচ্ছে না। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ মেরিনা কোর্টেস তাই আরো ভাল কিছুর সন্ধানে আছেন। কানাডার পেরিমিটার ইনস্টিটিউটের লি স্মোলিনের সাথে যৌথভাবে তিনি স্ট্রিং তত্তে¡র বিকল্প উপায়ে আরো মৌলিক জায়গা থেকে সময়ের সামনে চলার ব্যাখ্যা খুঁজছেন।

তাদের মতে মহাবিশ্ব এক গুচ্ছ অনন্য ঘটনার সমাবেশ নিয়ে গঠিত। কোনো ঘটনাই দুবার ঘটে না।প্রত্যেক ঘটনাই কেবল তার পরেরটিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ধারণা বোলজম্যানের ধারণার বিপরীত, যেখানে অ্যারো অব টাইম ছিল সম্ভাবনার সূত্র থেকে আসা একটি দূর্ঘটনা।

তবে সত্যি ব্যাপার যাই হোক, সময়ের সম্মুখ গতির ব্যাখ্যা পেতে হলে মহাবিশ্বের শুরুর দিকের নিম্ন এনট্রপির ব্যাখ্যা পেতেই হবে। দরকার হবে থিওরি এভরিথিং, সেটা স্ট্রিং থিওরিই হোক আর কোর্টেসদের প্রস্তাবনাই হোক। এক কথায় ক্যারোল সারমর্ম দিচ্ছেন, ‘নিম্ন এনট্রপির বিগ ব্যাংয়ের ব্যাখ্যা পেলেই কাজ শেষ। অতীত ও ভবিষ্যতের সব পার্থক্যই তখন আমাদের জানা হয়ে যাবে।’

মহাবিশ্বের শুরুতে (ইমেইলে আছে। ফণ্টে ঘাপলা)

মহাবিশ্বের প্রথম কয়েক সেকেন্ড

https://www.space.com/big-bang-first-few-seconds

মহাবিশ্ব কত জোরে প্রসারিত হচ্ছে?

বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে জন্ম। সেই থেকে পাগলা ঘোড়ার মতো বড় হচ্ছে মহাবিশ্ব। হচ্ছে প্রসারিত। আর ক্রমেই প্রসারণে বেগ বাড়ছে। কিন্তু আসলে কত জোরে ঘুরছে মহাবিশ্ব? এই একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বলে দেবে আসলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ভুল কি ঠিক।

মহাবিশ্বটা বড়। অনেক বড়। মহাবিশ্বের যে কোনো দিকে তাকালে আমার সর্বোচ্চ ৪,৬০০ কোটি আলোকবর্ষ দূর পর্যন্ত দেখতে পাই। ১৩৮০ কোটি বছর আগে জন্মের পর থেকে মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ এতটা দূরের আলো আমাদের কাছে আসতে পেরেছে। তবে এটাও নিছক অনুমান। কেউই সঠিক করে বলতে পারবে না, মহাবিশ্ব আসলে কত বড়।

মহাবিশ্বের সঠিক বয়সও আমাদের জানা নেই। সে কারণেই আসলে মহাবিশ্ব বা পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্ব ঠিক কত বড় তাও বলার উপায় নেই।

তাও একটি ভাল অনুমান পেতে বিজ্ঞানীরা মরিয়া। যে প্রচেষ্টারই এক হাতিয়ার হাবল ধ্রুবক। মহাবিশ্ব কত জোরে প্রসারিত হচ্ছে তারই পরিমাপক এই সংখ্যা। মহাবিশ্বের আকার ও বয়স দুটোই সঠিকভাবে জানতে হলে এই ধ্রুবক জানার কোনো বিকল্প নেই। একটু বেলুন ফুলতে থাকলে যেমন অবস্থা হবে তার সাথে কিছুটা মিল আছে মহাবিশ্বের। ছায়াপথ ও নক্ষত্ররা হলো বেলুনের গায়ের বিন্দুর মতো। সবগুলো বিন্দু একে অপর থেকে দূরে সরছে। যাদের পরস্পর দূরত্ব বেশি তারা তত বেশি জোরে সরছে। তার মানে, আমাদের থেকে যে ছায়াপথ যত বেশি দূরে সেটি দ্রুত দূরে হারিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু হাবল ধ্রুবক যেন এক সোনার হরিণ। বিজ্ঞানীরা এতই একে মাপেন ততই এটি মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিচ্ছে। একভাবে মেপে একটি মান পাওয়া গেলো তো আরেকভাবে মাপলে পাওয়া যাচ্ছে অন্য একটি মান। একটি উপায় হলো সরাসরি মাপা। আরেকটি উপায় হলো মহবিশ্ব সম্পর্কে আমরা যা জানি সে জ্ঞানের ভিত্তিতে মান বের করা। এই দুই মান একমত না হবার অর্থ কী? হয় পরিমাপ করতে ভুল হচ্ছে। নয়তো মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণায় গ্ণডগোল আছে।

তবে বিজ্ঞানীদের এখন বিশ্বাস, তারা সঠিক মানের খুব কাছে চলে এসেছেন। এ আত্মবিশ্বাসের কারণ নতুন কিছু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। প্রধান একটি অসুবিধা হলো প্রকৌশলগত দিক। আমাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা ক্ত নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে মাপতে পারি। এর জন্যে শুধু এক গাদা উপাত্ত সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। পরিমাপ পদ্ধতির নির্ভুলতা যত উপায়ে সম্ভব যাচাই করতে হবে। সূত্রহীন কোনো খুনের ঘটনার কিনারা করাও আরু সহজ।

ধ্রুবকটি প্রথম মাপেন হাবল নিজে, যাঁর নাম থেকে ধ্রুবকের এই নাম। ১৯২৯ সালে মেপে তিনি এর মান পান প্রতি মেগাপারসেকে প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ কিলোমিটার বা ৩১০ মাইল। এর অর্থ হলো প্রতি এক মেগাপারসেক দূরের ছায়াপথ আমাদের থেকে সেকেন্ডে ৫০০ কিলোমিটার বেশি বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। এক পারসেক হলো আলোর বেগের ৩.২৬ আলোকবর্ষের সমান। আর মেগা হলো তার ১০ লক্ষ গুণ। এক মেগাপারসেককে কিলোমিটারে বুঝতে হলে ৩০৯ লিখে তার ডানে ১৭টি শূন্য বসাতে হবে।

গত প্রায় এক শ বছরে হাবলের পরিমাপকে অনেকবার সংশোধন করা হয়েছে। প্রাপ্ত মান কমেছে অনেক। বিংশ শতকের বেশিরভাগ সময়জুড়ে মান ছিল ৫০ থেকে ৯০ এককের মধ্যে। গত ৯০-এর দশকে মহাবিশ্বের ল্যামডাসিডিএম মডেল ও মহাজাগতিক পটভূমিক বিকরণের পর্যবেক্ষণ কাজে লাগিয়ে দেখা যায় ধ্রুবকের মান ৭০-এর কাছাকাছি। ২০১৮ সালে প্ল্যাঙ্ক মিশনের পরিমাপ বলে ৬৭.৪৪ এর আশেপাশে হবে এই মান। কিন্তু আবার ২০১৯ সালের মার্চে হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে পরিমাপ করে পাওয়া যায় ৭৪.০৩ এর আশেপাশের মান। আশেপাশের মান বলার কারণ হলো, অনেক নমুনা ব্যবহার করে বের করা এই মানগুলোতে সবসময় একটু অনিশ্চয়তা থাকে। যেমন সঠিক করে বললে সর্বশেষ পরিমাপ বলছে, ধ্রুবকের মান ৭৪.০৩ ±১.৪২। বর্তমানে ধ্রুবকটির মান ৬৭ থেকে ৭৪ ধরা হয়।

একটি সমস্যা হলো, কীভাবে মাপা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে পাল্টে যায় মান।

সূত্র

* <https://www.bbc.com/future/article/20210326-the-mystery-of-our-expanding-universe>
* https://www.pnas.org/content/15/3/168.short